সূচীপত্র।

আলোচনা পত্রিকার নিয়মাবলী।

আলোচনার বার্ষিক মূল্য সহর মফস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ২।৵০ আনা। সাধারণ সমিতি বা পাঠাগার হইতে ৴১০ অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ আবেদন করিলে নমুনা প্রদত্ত হইবে। বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ।

বিজ্ঞাপন দেওয়ার নিয়ম—মাসিক একপৃষ্ঠা বা দুই কলম—৮৲, অর্দ্ধপৃষ্ঠা বা এক কলম ৪॥০, সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম—২।০ সিকি কলম—২৲।

কভারের পৃষ্ঠার জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম। ছয় মাস বা তদূর্দ্ধ কালের জন্য বিজ্ঞাপনে স্বতন্ত্র চুক্তির দর দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। চুক্তির বিজ্ঞাপন তিন মাসের মধ্যে পরিবর্ত্তন করা হয় না।

আলোচনার জন্য বিনিময় পত্রিকা ও প্রবন্ধাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে। অন্যান্য চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই আমার নামে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ,
কর্ম্মযোগ প্রেস, ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।
(ফোন নং ১৯১ হাওড়া)

শ্রীশ্রীকালীকান্তায় নমঃ।

আলোচনা।

"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।"

অষ্টবিংশতি বর্ষ।] বৈশাখ, ১৩৩১ সাল। [প্রথম সংখ্যা।

কোনও দাতার উদ্দেশে

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

চাঁদার খাতায় নাম ওঠে যে মিছে,
আপন-মনে ভাব্‌চ দানের গণ্ডী,
দিতে হ'বে 'আপনাকে' যে নিজে,
যা'কে তা'কে দিচ্চ কেটে' হুণ্ডী!
জাননাত কা'কে বলে দান,
ভুলটা নিয়ে আছ মহাব্যস্ত,
দিতে হ'বে দানের সনে প্রাণ,
হাত বাড়া'লে দান হ'ল না মস্ত!
সফলতা লাভ করিতে গেলে
শক্তিটি চাই নয়ক শুধু দম্ভ,
মজ্জমানে দিচ্চ ডুরি ফেলে'
দিতে হ'বে জলেই তোমার লম্ফ!

বিচার

শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ

অক্ষয় বাবু হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইলেও গোঁড়া হিন্দু ছিলেন না। তাঁহার মতামত চালচলন কোনটাই তেমন সমাজ মানিয়া চলিত না। তিনি নিজেও বিধবা বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা চপলারও বিধবা বিবাহ দিয়াছিলেন। উপরন্তু তিনি তাঁহার পুত্র কন্যাগণকে অবাধে সকলের সহিত মেলামেশা করিতে দিতেন। তাহাদের কোন আকাঙ্খা, কোন আবদারই তিনি অসম্পূর্ণ রাখিতেন না।

সমাজের শৃঙ্খল বেড়ীরূপে পায়ে না পরিলেও সমাজের শাসন, সমাজের আইন কানুন, এবং সমাজের সীমা একেবারে অগ্রাহ্য করা যুক্তিসঙ্গত কিনা অক্ষয় বাবু তাহা এক দিনও ভাবিয়া দেখেন নাই। কন্যার উপর্য্যুপরি দুইবার বিধবা হওয়ার পর পুনরায় বিবাহ দিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না বটে, কিন্তু তিনি এক দিনের জন্যও কন্যাকে বৈধব্য নিয়মাদি পালন করিতে দেন নাই। আশৈশব তিনি তাহাকে যেরূপ প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন আজও তাহায় কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করেন নাই। পিতার স্নেহ পিতার সন্তানবাৎসল্য এবং পিতার কোমলতাই শুধু তাঁহার হৃদয়ে ছিল, কিন্তু সন্তানকে মানুষ করিতে গেলে যতখানি কঠোরতার প্রয়োজন, কর্ত্তব্যপালন করিতে গেলে হৃদয়ের সমস্ত করুণার উৎসকে যতখানি নিভৃতে গোপন রাখা প্রয়োজন, ততখানি শক্তি বা ক্ষমতা তাঁহার ছিল না।

ফলে চপলার ঔদ্ধত্য সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল, চিত্তের চাঞ্চল্য দিন দিনই বাড়িয়া গিয়াছিল। মনের ইচ্ছাকে দমন করিবার ক্ষমতা তাহার মোটেই ছিল না। সংযম-শক্তি তিল মাত্রও তাহার হৃদয়ে ছিল না। সে যাহাই ধরিত তাহাই করিত, নিজে যাহা ভাল বুঝিত তাহাই করিত। কাঁদিয়া কাটিয়া উপবাস করিয়া যেমন করিয়াই হউক সে তাহার আব্দার বজায় রাখিত।

লঘুচিত্ত অক্ষয় বাবু কন্যার চোখে জল দেখিলে সমস্ত ভুলিয়া যাইতেন, কন্যার মুখ বিষণ্ণ দেখিলে তাহার কোন আবদারেরই প্রতিবাদ করিতেন না। চপলার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর অতিক্রম করিয়া গেলেও অক্ষয় বাবু

তাহাকে যে স্নেহদৃষ্টিতে দেখিতেন এবং প্রকাশের সহিত তাহার মেলামেশার ভিতর তিনি কিছুই খারাপ দেখিতেন না বরং তিনি মনে করিতেন যে এই অল্প বয়সেই চপলা যেরূপ শোক পাইয়াছে ইহাতে যত সে অন্য সকলের সহিত মেলামেশা করিবে ততই তাহার চিত্ত ভাল থাকিবে।

চপলা যখন বেথুন কলেজে পড়িত তখনই তাহার প্রকাশের সহিত আলাপ হয়। তাহার এক সহপাঠীর বাড়ীতে প্রকাশ থাকিত। চপলা প্রায়ই সেইখানে যাইত। সেই আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠতাতে পরিণত হয়। প্রথমে প্রকাশের সহিত বিবাহের কথা হয়। কিন্তু কোন কারণে তাহা হয় নাই। প্রথমবার বিধবা হইবার পর পুনরায় যখন তাহার বিবাহের কথা হয় তখন প্রকাশ এখানে ছিল না, বিলাত গিয়াছিল। অক্ষয় বাবু আর একজনের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু এবারও সে বিধবা হইল। অক্ষয় বাবু এবারে আর তাহার বিবাহ দিলেন না।

কিন্তু চপলার সহিত প্রকাশের মেলামেশার কিছুই হ্রাস হইল না বরং দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে যখন তাহা দৃষ্টিকটু হইয়া দাঁড়াইল অক্ষয় বাবু দেখিলেন যে আর তাঁহার কোন হাত নাই। তাঁহারই প্রশ্রয়ে তাহারা অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কন্যার ব্যবহারে কন্যার কথাবার্ত্তায় তিনি মাঝে মাঝে বিরক্ত হইয়া উঠিতেন বটে কিন্তু কন্যার মুখ দেখিয়া তাহার চোখে জল দেখিয়া সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিতেন।

কিন্তু কন্যার শত অপরাধ সত্ত্বেও এবং প্রকাশের সহিত এইরূপ অবাধে মেলামেশা সহস্রবার দৃষ্টিকটু হইলেও এ বিশ্বাসটুকু তাঁহার মনে দৃঢ় ভাবে ছিল যে চপলা কখন তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধূলিবিলুণ্ঠিত করিবে না। সে সম্বন্ধে তিনি একরূপ নিশ্চিন্তই ছিলেন। কাজেই কেহ যদি সাবধান করিয়া দিত তিনি হাঁসিয়া বলিতেন "সে বিশ্বাস আমার মেয়ের ওপর আছে। আর তাছাড়া এখন তার বয়স হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে।" স্নেহান্ধ পিতা কাহারও কোন সতর্কতাই গ্রাহ্য করিতেন না।

তাঁহার একমাত্র পুত্র মণ্টু
অত্যধিক প্রশ্রয়ে বিগড়াইয়া গিয়াছিল। নিকট টাকা চাহিয়া কখন সে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে নাই। যখন যাহা চাহিয়াছে তাহাই পাইয়াছে। পুত্র কোন অপরাধ করিলেও তিনি তাহাকে কেবল মাত্র আদর করিয়া বুঝাইয়া দিতেন যে এরূপ কার্য্য

কখন করিতে নাই। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের এ স্নেহের প্রস্রবণ করুণার এধারা মণ্টু একেবারেই গ্রাহ্য করিত না। দিবা রাত্রই আড্ডা লইয়াই সে থাকিত! কোথায় মিটিং হইতেছে, কোথায় ভাল থিয়েটার হইতেছে, কোথায় ফুটবল ম্যাচ হইতেছে—এই সমস্তই তাহার লক্ষ্য ছিল। চব্বিশঘণ্টার মধ্যে রাত্রে মাত্র চার পাঁচঘণ্টা সে বাড়ীতে থাকিত। তাহাও আবার মাঝে মাঝে অন্যত্র কাটাইয়া দিত। তাহার স্বভাব ছিল উদ্ধত। তাহার মেজাজ সদাসর্ব্বদাই সপ্তমে চড়িয়া থাকিত। কলেজ প্রবেশ করিয়া তাহার প্রকৃতি আরও খারাপ হইয়া গেল।

অক্ষয় বাবু সমস্তই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিজের হৃদয়ের উপর কোনই অধিকার ছিল না। যখন তিনি চপলা কিংবা মণ্টুর নিকট হইতে অত্যন্ত আঘাৎ পাইতেন তখন শুধু এইটুকু বলিয়াই অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন যে অবোধ সন্তানেরা পিতামাতার হৃদয়কে গ্রাহ্য করে না। তাহারা বুঝে না যে তাহারা পিতামাতার কত আদরের, কত স্নেহের।

মণ্টুর সম্বন্ধে যদি কেহ তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিত, তিনি হাঁসিয়া বলিতেন, "ওরা ছেলে মানুষ, কিছু বোঝে না। আহা! মাতৃ-হারা সন্তানেরা আমার!"

কিন্তু তিনি নির্ব্বোধ ছিলেন না। তাঁহারি জ্যেষ্ঠা কন্যা চপলা এবং পুত্র মণ্টু যে তাঁহার মনের মত হইল না ইহা তিনি বেশ বুঝিতেন, কিন্তু বুঝিয়াও তাহার কোন উপায় করিতে পারিতেন না। তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগের নিকট কেবল মাত্র বলিতেন "জীবনের প্রারম্ভেই যে ভুল করেছি, আমরণ কাল আমায় তারই প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হবে।"

তাঁহার অনুতপ্ত জীবনের এক মাত্র সান্ত্বনা ছিল তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা লক্ষ্মী। একই পিতার ঔরসে তিনটী সন্তান। কিন্তু লক্ষ্মী অপর দুইটি অপেক্ষা অনেক ভাল। সেবা শুশ্রূষায় অতিথি সৎকারে লক্ষ্মী অদ্বিতীয়া ছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর অক্ষয় বাবু একরূপ চিররুগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন মুহুর্মুহু জ্বর পাওয়া ফিট হওয়া তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার বুকে একরূপ বেদনার সৃষ্টি হইয়াছিল। কোন রকমে উত্তেজিত হইলেই সেই বেদনাটী বাড়িয়া উঠিত। এক মাত্র লক্ষ্মীই দিবা রাত্র তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিত। তাঁহার কাছে কাছে থাকিত। তিনি একই ভাবে তিনটী সন্তানকে মানুষ করিয়াছিলেন কিন্তু একই মূল হইতে তিনটী বিভিন্ন বৃক্ষ উৎপন্ন

হইয়াছিল।

ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধেও লক্ষ্মীর মত ছিল অন্যরূপ। পিতার সহিত এ সম্বন্ধে সে কত তর্ক করিত, কত আলোচনা সমালোচনা করিত। অনেক সময়ে সে পিতার কথা বিশ্বাস করিত আবার অনেক সময়ে পিতাকে তর্কে হারাইয়া দিত। বৃদ্ধ বয়সে অক্ষয় বাবুরও ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে মতামতের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। উত্তপ্ত শোণিত শীতল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বার্দ্ধক্যের আগমনে যৌবনের উদ্দাম গতির বেগ হ্রাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অক্ষয় বাবুর মতেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। মাঝে মাঝে তিনি স্পষ্টই বলিতেন "আমার জীবনের কর্ম্মফলই আমার এত দিনকার দৃঢ় মতকে ক্রমশঃই টলিয়ে দিচ্চে লক্ষ্মী, আর টলিয়ে দিচ্চে তোমারি ভাই বোন দুটী।"

চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ক্রম হইলেও লক্ষ্মীর বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা অনেক ছিল। চিত্তে তাহার শক্তি ছিল, দৃঢ়তা ছিল, ভগবানে তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল, হিন্দু ধর্ম্মে তাহার আন্তরিক ভক্তি ছিল।

অক্ষয় বাবু এই ক্ষুদ্র সংসারটুকু লইয়া কলিকাতার এক প্রান্তে বাস করিতেন।

তাঁহার পরিবারভুক্ত না হইলেও, সুরেন তাহার পুত্রাধিক ছিল।

তাঁহার দুঃখে কষ্টে, বিপদে আপদে, মন্টু অপেক্ষা সুরেনই তাঁহার বেশী আপনার ছিল। যখন লক্ষ্মী ও সুরেন তাঁহার কাছে থাকিত, তখন তিনি ভাবিতেন, তাঁহার জীবনে কোন ভুল হয় নাই, তাঁহার জীবন শান্তিময়, এই পৃথিবীই তাঁহার স্বর্গ। মুখে কখন প্রকাশ না করিলেও তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল লক্ষ্মী ও সুরেনকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন। কিন্তু জীবনে আঘাতের পর আঘাত সহ্য করিয়া কোন কিছু ভাল জিনিষ তিনি ভাবিতে পারিতেন না।

তাই তিনি মনের ইচ্ছা মনেই রাখিয়াছিলেন। শুধু তাহাদের দেখিতেন আর মনে মনে আনন্দ উপভোগ করিতেন এবং ভগবানকে বলিতেন "তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক প্রভু।"

২

উপর্য্যুপরি তিনটী পুত্র ও দুইটী কন্যার মৃত্যুর পর সুরেনের পিতা সেই যে শয্যা গ্রহণ করিলেন আর উঠিলেন না। সেই শয্যাই তাঁহার অন্তিম শয্যা হইল, সেই শয়নই তাঁহার মহানিদ্রায় অবশান হইল।

পিতার মৃত্যুর পর সুরেন পৃথিবী অন্ধকার দেখিল। পিতার জীবিতাবস্থায় শুধু সে লেখা পড়াই করিয়া আসিয়াছে। সংসার বলিয়া একটা যে কিছু আছে তাহা সে জানিত না।

সংসারের চিন্তা কখন যে তাহাকে করিতে হইবে ইহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। শুধু লেখা লইয়া, শুধু কল্পনা লইয়াই সে থাকিত।

কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর যখন তাহার মধুর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গল, সমস্ত কল্পনা যখন কঠোর বাস্তবের মূর্ত্তি লইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, সুরেন তখন বুঝিল যে এ পৃথিবীকে সে যতখানি সহজ ও সরল বিবেচনা করিয়াছিল ঠিক ততখানি সহজ ও সরল এ পৃথিবী নহে।

সুরেনের কোন ভ্রাতাই অল্প বয়সে মারা যায় নাই। ভগ্নী দুইটিরও বিবাহ হইয়াছিল। সুরেন কনিষ্ঠ পুত্র। সুরেনের পিতা উপার্জ্জনও করিয়াছিলেন যেমনি, ব্যয়ও করিয়াছিলেন তেমনি। তাঁহার দান ধ্যান যথেষ্ট ছিল। মাসে মাসে তিনি অনেক টাকা সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন। নিজেও তিনি কখন কষ্ট করেন নাই, স্ত্রীকেও কখন কষ্ট দেন নাই। পুত্রকন্যা-দিগের যতদূর সম্ভব সুখেই মানুষ করিয়া ছিলেন। কষ্ট কাহাকে বলে এক দিনের জন্যও তাহারা জানে নাই।

কিন্তু তিনি এক পয়সাও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। কেহ তাঁহাকে সঞ্চয়ের কথা বলিলে তিনি বলিতেন, "কাহাদের জন্য সঞ্চয় করিব, কেন সঞ্চয় করিব? পুত্রেরা আপনাদের কপালে করিয়া খাইবে। আমার কর্ত্তব্য মানুষ করা; তাহা আমি করিয়া দিয়া যাইব।

যথার্থ তিনি করিয়াছিলেন তাহাই। তাঁহার চারিটি পুত্রকেই তিনি মানুষ করিয়া দিয়াছিলেন

একে একে সকলেই ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কন্যাদুইটীও তাহাদের অনুসরণ করিল। সুরেনের পিতা শোক সম্বরণ করিতে না পারায় তিনিও মারা গেলেন। পৃথিবীতে রহিল শুধু সুরেন আর তাহার বিধবা জননী।

দুই শত টাকা বাটী ভাড়া দিয়া বাস করা তাহাদের আর পোষাইল না। দেশে যাহা ছিল পাঁচ জনে তাহাও আত্মসাৎ করিল। আত্মীয় স্বজনেরা ফিরিয়াও চাহিল না।

তখন অক্ষয় বাবুই তাহাদের নিজ বাটীতে স্থান দিলেন; বহুকাল হইতেই অক্ষয় বাবুর সহিত সুরেনের পিতার বন্ধুত্ব ছিল। সুরেনের পিতা অনেক সময়ে অক্ষয় বাবুর অনেক উপকার করিয়াছিলেন। অক্ষয় বাবু তাহা ভুলিয়া যান নাই।

সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী পুত্রের ভার তিনি সাদরেই গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সুরেনের জননী স্বরস্বতী দেবী ইহাতে অত্যন্তই কুণ্ঠিতা হইয়া পড়িলেন। কাহারও গলগ্রহ

হইয়া থাকা তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না। সেইজন্য অনেক সাধ্য সাধনা এবং চেষ্টা চরিত্রের পর সুরেনের যখন একটি চাকুরী হইল তিনি আর সেখানে রহিলেন না। একটী ছোটখাট বাটী ভাড়া করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। অক্ষয় বাবু অনেক আপত্তি করিলেন, লক্ষ্মী অনেক মিনতি করিয়া বলিল, কিন্তু তিনি কাহারও কথা শুনিলেন না। তা বলিয়া তিনি অক্ষয় বাবুর সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন না। তাঁহার অসময়ে তিনি যে তাঁহাদের আশ্রয় দিয়াছিলেন এ উপকার তিনি কখনও ভুলেন নাই এবং ইহারি জন্য তিনি অক্ষয় বাবুর নিকট চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন।

এক বৎসর চাকুরীর পর সুরেনের চাকুরী গেল। তখন সব যেই লোক কমাইতেছে। সুতরাং সুরেনের আর কোথাও চাকুরী হইল না। সরস্বতী দেবী অত্যন্ত চিন্তান্বিতা হইয়া পড়িলেন। সুরেনও ভাবনায় পড়িল। এ সম্বাদ পাইয়া অক্ষয় বাবু পুনরায় তাহাদের নিজ বাটীতে আনিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু সরস্বতী দেবী ঘোরতর আপত্তি জানাইলেন। তাহার উন্নত হৃদয়ে আঘাৎ লাগিবে বলিয়া অক্ষয় বাবু আর কিছু বলিলেন না।

লক্ষ্মী কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছিল। সরস্বতী দেবীর নিকট হইতে লক্ষ্মী এই আপত্তিই আশা করিয়াছিল। এইরূপই সে ভাল বাসিত। ক্ষণিকের দুর্ব্বলতাই প্রথম বারেই তাহাকে বিচলিত করিয়াছিল। তাই সে সেবারে অত- করিয়া সরস্বতী দেবীকে থাকিতে অনুরোধ করিয়া ছিল। কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রত্যাখ্যানই লক্ষ্মীর চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

ব্যথার বীণা

শ্রীপরেশনাথ চৌধুরী

মিলনের সুখে যাহা উছলায় রোদনে,
ভাষা যার আঁখিধার বিরহের বোধনে,
যে বেদন অকারণ বাঁশী বয় বাতাসে,
আমারই বীণাতারে আজি হায় বাঁধা সে।
বকুলের তল ছেয়ে যে নিশাস গুমরে,
যে দুখের দ্যোতনায় মোহ পায় ভ্রমরে,
অশোকের বুক ছায় যে ব্যথার শোণিতে,
বীণা মোর মুরছায় আজি তার ধ্বনিতে।
আকাশের নীলিমায় যে বিষাদ জড়ায়ে,
জোছনার গাসিমায় যে কাঁদন ছড়ায়ে,
যে বেদন পায় রূপ গোধূলির আভাসে,
আমারই বীণাতারে আজি হায় বাঁধা সে।

কলিকাতায় অদ্ভুত জুয়াচুরি

"লেবারার্স ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড"

রহস্যপূর্ণ কাহিনী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীঅমূল্যচরণ মিত্র

বিগত মাসের পত্রিকাতে লেবারার্স ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে মাত্র কয়েকটী কথা লিখিয়াছিলাম, অদ্য উক্ত ব্যাঙ্কের রহস্য সাধারণের এবং মহামান্য গভর্ণমেণ্টের অবগতির জন্য উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিব।

কলিকাতায় অফিস কোয়ার্টারের মাঝখানে ২১ নং ক্যানিংষ্ট্রীটস্থ একটী ত্রিতল বাড়ীর উপরের তালায় এক নিভৃত কক্ষে উক্ত ব্যাঙ্কের আড্ডা অবস্থিত ছিল। ব্যাঙ্কের যে সকল অনুষ্ঠান থাকা আবশ্যক তাহার সমস্তই ছিল, কিন্তু ছিল না একটী জিনিস সেটী রূপচাঁদের সুমিষ্ট শব্দ এবং ক্যাস ঘর। ঝক্‌ঝকে, চক্‌চকে পিতলের রেলিংযুক্ত উচ্চ counter ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সাহেবের অফিস রুম, ডাইরেক্টর গণের সভা কক্ষ প্রভৃতি সমস্তই ছিল। দীননাথ মজুমদারই ইহার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন।

অর্থ সংগ্রহের জন্য ছিল ২১ নং ওল্ডকোর্ট-হাউস ষ্ট্রীটের "ভারত সারভিস্ সিকিওরিং এজেন্সি"—এই এজেন্সিটি উক্ত ব্যাঙ্কের সহিত এরূপভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল যে উহার বিবরণ এস্থলে সবিশেষ উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধটী অসম্পূর্ণ থাকিবে। ১৯২০ সাল এই চাকুরী সংগ্রহকারী এজেন্সির আড্ডা ছিল ৩১নং বটতলা ষ্ট্রীটে। পরে সাহেব মহলে আসিয়া পূর্ণোদ্যমে কার্য্য আরম্ভ করে। ইহার Telegraphic Address—"Vacancy" Calcutta—post Box No Nil Managing Agents ছিল—Alfred Roberts & Co. অর্থাৎ A. Mukherji & R. Talukdar। সিমলা শৈলে ও লাহোরেও ইহার Branch office ছিল। কলিকাতা সহরে পাঁচজন এজেণ্ট ছিলেন। এই firm এর ম্যানেজার ছিলেন Mr. R. Talukder ওরফে রেবতি তালুকদার। এই তালুকদার মহাশয়ই লেবারার্স ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অন্তিমকালে Asstt. Manager হইয়া

লালবাতি জ্বালাইবার সহায়তা করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত ব্যাঙ্কটী সংস্থাপন হইবার পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রধান ইংরাজী সংবাদপত্রে এই Service Securing Agency কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত মর্ম্মে বিজ্ঞাপন প্রায় বৎসরাবধি ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল—

"Wanted Inspectors and Organisers for a Bank on Rs. 100 per month. Cash Security required Rs. 500. Apply to the B S. S. A. 21. Old Court House Street, Calcutta,

বিজ্ঞাপিত চাকুরির বিশেষত্ব এই যে, কর্ম্মপ্রার্থীদিগের কোনও qualification এর আবশ্যকতা নাই। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা যে কেহ নগদ ৫০০৲ পাঁচশত টাকা অগ্রিম জমা রাখিতে পারিবে, তাহাকেই নিযুক্ত করা হইবে। নিয়োগের সর্ত্ত এই যে Service Securing Agencyর নিকটে উল্লিখিত ৫০০৲ টাকা অগ্রে জমা রাখিতে হইবে এবং তৎসহ প্রত্যেকের অর্দ্ধ মাসের বেতন অর্থাৎ ৫০৲ টাকা এবং Registration fee বাবত ৬৲ মোট ৫৫৬৲ টাকা এককালীন দিলে, তবে আবেদন কারীকে ব্যাঙ্কের নাম, ঠিকানা বলিয়া দিয়া একখানি নিয়োগ পত্র দেওয়া হইবে। চাকুরির বাজারে ত আগুন লাগিয়াছে। কত শত এম্-এ; বি-এ; এম্ এস্ সি; বি এস্-সি পাশকরা যুবক সামান্য ৩০৲ ৪০৲ টাকার চাকুরির জন্য হ্যা হ্যা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, মাত্র ৫০০৲ টাকা জমা দিয়া ১০০৲ টাকা মাহিনার চাকুরি! তাহাতে আবার ব্যাঙ্কের Organiser অথবা Inspector! এ কি সহজ কথা? দলে দলে শত শত শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত কোয়াটার শিক্ষিত বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ ঘটি, বাটি, জরু, ভিটে মাটি বেচিয়া, বাঁধা দিয়া যে কোনও উপায়ে ৫৫৬৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া ভারত সার্ভিস সিকিউরিং এজেন্সির প্রধান আড্ডাখানায় সমবেত হইতে লাগিল। রাতারাতি বড়লোক হইবার এরূপ চমৎকার পন্থা ইহার পূর্ব্বে আর কেহ আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে পতঙ্গ যে প্রকারে আচম্বিতে ঝাঁপ দিয়া অবশেষে পুড়িয়া মরে, অপরিণামদর্শী কর্ম্মপ্রার্থীরা দলে দলে আসিয়া লেবারাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অর্গানাইজার, ইন্সপেক্টর, ক্যাশিয়ার, বেনিয়ান প্রভৃতি হইবার লোভে আসিয়া তদ্রূপ জুটিতে লাগিল—কিন্তু মজা জুটিতে লাগিল —Alfred Roberts & Co. প্রত্যেক

Candidateএর নিকট হইতে অগ্রিম ৫৬৲ অর্থাৎ নগদ চৌদ্দগণ্ডা টাকা লইয়া পকেটস্থ করিতে লাগিল; তাহার উপর ব্যাঙ্কের নিকট হইতে একটা মোটা কমিশনও কি না পাইত?

এস্থলে ইহা বলা বাহুল্য যে যতদিন ঐ ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব বজায় ছিল, ততদিনই কেবল Organiser এবং Inspectorই ঐরূপে নিযুক্ত হইয়াছিল। যে দল প্রথমে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যাহারা একটু কড়া রকমের লোক, তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে ১০৲ ১৫৲ টাকা করিয়া মাহিনা দিয়া D. N. Mazumder ঠাণ্ডা করিয়া রাখিত। কিন্তু তাহাদের কার্য্য ছিল ১০৲ টাকার share বিক্রয় করা। দেশের লোক গত ২৫ বৎসর ধরিয়া জুয়াচোর প্রভিডেণ্ট ইণ্ডিওর কোম্পানি, টি কোম্পানি প্রভৃতি নানা প্রকার দেশীয় কোম্পানী কর্ত্তৃক বিভিন্ন প্রকারে উত্যক্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহার উপর একটা দেশী নূতন ব্যাঙ্কের অংশ বিক্রয় করা কার্য্য যে কিরূপ কষ্টসাধ্য ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়! ফলে কেহ ১টী কেহ বা ২।৩টী অংশ আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অতিকষ্টে বিক্রয় করিয়াছে, কেহ বা চাকুরি বজায় রাখিবার জন্য অপরের নাম দিয়া নিজেই ২।৪ খানি অংশ ক্রয় করিয়াছে। মোট কথা, কেহই ব্যাঙ্কের অংশ বিক্রয় করিতে সক্ষম হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু কর্ম্মচারিদিগের মাহিনা সমান ভাবে পাওনা হইয়া আসিতেছে। তখন বেগতিক দেখিয়া প্রথম দলকে কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত অছিলায় dismiss করিয়া দিল। দ্বিতীয় দলের মাহিনা পাওনা হইলে তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে তাড়াইয়া দিতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

মালবিকা

চরিত্র

অগ্নিমিত্র (নায়ক)	...	শুঙ্গ বংশের রাজা।
বাহুতক	...	প্রধান মন্ত্রী।
গৌতম	...	বিদূষক।
গণদাস	...	নাট্যাচার্য্য।
হরদত্ত	...	ঐ।
ধ্রুবসিদ্ধি	...	বিষবৈদ্য।
কঞ্চুকী (মৌদ্গল্য)	...	রাজবাটীর অন্তঃপুরচর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
সারস		কুব্জ ভৃত্য।

বৈতালিকদ্বয়, পরিজনবর্গ প্রভৃতি।

ধারিণী ... মহাদেবী।
ইরাবতী ... মধ্যমা মহিষী।
মালবিকা (নায়িকা) ... বিদর্ভরাজকন্যা, মাধবসেনের ভগিনী।
কৌশিকী ... পরিব্রাজিকা, বিদর্ভরাজ্যের অমাত্য সুমতি ভগিনী।
বকুলাবলিকা ... মালবিকার সখী।
কৌমুদিকা ... ধারিণীর চেটী।
সমাহিতিকা ... পরিব্রাজিকার পরিচারিকা।
মধুকরিকা ... উদ্যান পালিকা।
নিপুণিকা ... ইরাবতীর পরিচারিকা।
জয়সেনা ... প্রতীহারী।
শিল্পকারিকাদ্বয়, পরিজনবর্গ প্রভৃতি।

মালবিকা

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

নাট্যশালার সম্মুখস্থ রাজপথ

(বকুলাবলিকার গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

বাঞ্ছিত ধন মিলিবে, সখি, মিলিবে ;—
জীবন-সঙ্গী লভিবে ত্বরা লভিবে।
অমৃত-কন্দ ক্ষরিয়া চলিবে গলিয়া ক্ষরিয়া,—
রসের কুম্ভ ভরিবে তাহে ভরিবে।
বেদনার রেখা লাগে না, যেন নয়নে অশ্রু ঝরেনা,
উত্তরোল গীতে রোধিবে তায় রোধিবে।
ব্যথিত হাসি অধরের, করুণ-আলো নয়নের,—
মিলন-দিবসে নিভিবে তাও নিভিবে।
পীযুষ-লোভে তুমি হায়, ভ'রেছ পাত্র মদিরায়!
শুভখ'ণে সই, মিলিবে সুধা মিলিবে।

বকুলা—(স্বগতঃ), সখি মালবিকা "ছলিক" নাটকের অভিনয় কতদূর কি শিখ্‌লেন, নাট্যাচার্য্য গণদাসকে তাই জিজ্ঞাসা কর্‌তে দেবী ধারিণী আমায় পাঠিয়েছেন। তাঁরও যেমন কাজ! এই তুচ্ছ ব্যাপারটা জান্‌তে কি না আমায় পাঠান! কেন, বাড়ীতে কি আর লোক নেই? খাবার বেলা এক পাল এসে জুটবে, আর খেটে মর্‌বো আমি! তা যাক্ সে সব কথা অনেক দিন পরে যখন আজ বাইরের আলোয় এইছি, তখন একটু ঘুরে যাই। তাইত,—ও, কে, ও, সখি কৌমুদিকা না?—

(অলঙ্কার হস্তে ধারিণীর দ্বিতীয়া পরিচারিকার প্রবেশ)

ওলো—ও সখি কুমুদ! [কৌমুদিকে]! বলি

আমাদের যে আর দেখ্‌তেই পাওনা! তা পাবেই বা কেন? আমরা হচ্ছি অতি তুচ্ছ লোক, তোমার মত ত আর আমাদের অত সৌভাগ্য হয়নি! আজ কাল গয়না নিয়েই নাড়া চাড়া করে থাক—মানুষ আর চোখে পড়বে কেন?

কৌমুদিকা। (চারিদিক চাহিয়া বকুলা-বলিকাকে দেখিয়া জিব কাটিয়া) কে, লো? সখি বকুলা নাকি? তুমি যে কি সব বাজে কথা বল ভাই তার ঠিক নেই তোমাকে যে তোমায় দেখ্‌তে পাইনি, একথা স্বপ্নেও ভেবো না। এই সর্পবিবহারক অদ্ভুত হীরের আংটিটা সেক্‌রা বাড়ী হ'তে আন্‌তে আন্‌তে পথে দেখ্‌তে দেখ্‌তে আস্‌ছিলুম, তাই তোমায় অত নজর করে দেখিনি। তা ভাই, কিছু মনে কোরো না।

বকু। সত্যি নাকি? কৈ দেখি ভাই। তাইত এ যে রাণীমার আংটী দেখ্‌ছি। আচ্ছা খাসা জিনিষ—এমন জিনিষ একবার চোখে পড়লে অন্যদিকে চোখ ফেরাতে আর ইচ্ছেও করে না।

কৌমুদ। তা যাক্ সে কথা। এখন কাজের কথা বলত ভাই—এদিক দিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোথা?

বকু। আর সে দুঃখের কথা বল কেন ভাই, রাণীমার যত সব বিদ্‌ঘুটে আব্দার আমার কাছে। মালবিকা তাঁর অভিনয় কতদূর শিখ্‌লেন তাই দেখ্‌তে যাচ্ছি।

কৌমুদ। আচ্ছা ভাই! মালবিকা ত থাকেন গণদাসের বাড়ী। তা আমাদের রাজা মশাই তাঁকে দেখ্‌লেন কি ক'রে?

বকু। না ভাই সে সব কথায় আমাদের কাজ কি? আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে দরকার কি? চাক্‌রী কর্‌তে এসেছি, চাক্‌রী কর্‌ব। রাজারাজড়ির কথার ভেতর থেকে কি দরকার? দশটাকার চাক্‌রী কর্‌তে এসে কি পৈতৃক প্রাণটা খোয়াব। প্রাণ থাক্‌লে অমন ঢের চাক্‌রী জুটবে।

কৌমুদ।—আমার মাথা খাস বল্‌না ভাই। তোর পায়ে পড়ি বল্। আমি কাউকে বল্‌ব না। সত্যি কচ্ছি, কাউকে বল্‌ব না।

বকু। আচ্ছা তবে শোন। কিন্তু সাবধান। এর একটু এদিক ওদিক্ হ'লে প্রাণ নিয়ে টানাটানি বেঁধে যাবে। রাণীমা যখন অভি-নেত্রীদের ছবি দেখ্‌ছিলেন, তখন মালবিকার ছবিখানি হঠাৎ মহারাজের চোখে পড়ে যায় তারপর থেকে রাণীমাকে কেবল কেবল জিজ্ঞাসা করেন ছবিটি কার। কিন্তু রাণীমা কোন উত্তর না দেওয়ায় রাজকুমারী বসুলক্ষ্মী বলেন যে

ওটা মালবিকার ছবি!

কৌমু। তারপর?

বকু। তারপর আর কি? মহারাজের সঙ্গে মালবিকার যাতে চোখোচোখি দেখা না হয় সেই জন্য রাণীমা আমাদের মালবিকাকে যথাসাধ্য লুকিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছেন।

কৌমু। (স্মিতমুখে) তা বেশ। যাক্‌, এখন ভাই, নিজের নিজের কাজে যাওয়া যাক্‌। সন্ধের সময় সব কথা হবে' খন।

বকু। ঐ যে নাট্যাচার্য্য আস্‌ছেন না। যাই একটু এগিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করি।

(গণদাসের প্রবেশ)

গণদাস। (স্বগতঃ), অভিনয় একটা কলা-বিদ্যা। আর আমাদের কুল-বিদ্যাও বটে। সুতরাং অভিনয় কর্‌লেই যে পাঁচ জনের কাছে নিন্দে শুন্‌তে শুন্‌তে প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'বে এর কোন কারণ নাই। অভিনয় কর্‌লেই যে লোকে গোল্লায় যায়, এমনও কোন মানে নেই; বিশেষতঃ ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ যখন বলেছেন, যে, এই অভিনয় দেবগণের অত্যন্ত আনন্দ-প্রদায়ক। স্বয়ং দেবাধিদেব হরগৌরীরূপে ইহা দু'ভাগ করেছেন, আর তা ছাড়া এতে সত্ব, রজঃ তম এই গুণত্রয় হইতে উদ্ভূত নানাপ্রকার লোক-চরিত্র ও নানাবিধ কাব্যরস বর্ত্তমান। আর সেই জন্যেই নানা প্রকৃতির লোক অভিনয় দেখে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। এমন যে জিনিষ—অভিনয়, এটা নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু খারাপ জিনিষ নয়। (চিন্তাকুল হৃদয়ে পাদচারণ)।

বকু। আর্য্য! প্রণাম হই।

গণ। কে তুমি? তোমায় যে রাজ-বাড়ীতে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

বকু। আজ্ঞে হাঁ, রাণীমা আমায় পাঠিয়েছেন, সখি মালবিকার অভিনয় শিক্ষা কতদূর হ'ল তাই জান্‌তে। তাঁর শিক্ষা বেশ চল্‌ছে ত?

গণ। ভদ্রে! দেবীকে জানিও যে, মালবিকার মত দুর্ল্লভ রত্ন বড় সহজে পাওয়া যায় না। তিনি অভিনয়েও যেমন নিপুণা আবার এদিকেও তেমনি বুদ্ধিমতী। এমন কি শিক্ষা দিতে দিতে সময়ে সময়ে আমার মনে হয় যে আমিই যেন তাঁর কাছে অভিনয় শিখ্‌ছি। এটা একটা বড় কম ক্ষমতার কাজ নয়!

বকু। (স্বগতঃ) ও বাবা! যে রকম শুন্‌ছি, তাতে বোধ হয় সখি মালবিকা বুঝি বা দেবী ইরাবতীকেও কলানৈপুণ্যে ছাড়িয়ে উঠ্‌লেন। (প্রকাশ্যে) তা আপনি নট-গুরু হ'য়ে যখন, এ রকম কথা বল্‌তে পারছেন তখন সখির শিক্ষা বোধ হয় নিষ্ফল হয় নি।

গণ। নিষ্ফল! হা! হা! আর সব নিষ্ফল

হ'তে পারে,—পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠ্‌তে পারে, কিন্তু মালবিকার শিক্ষা কখন নিষ্ফল হবে না। ভদ্রে, এটা ঠিক্ জেনো গণদাস কখন মিথ্যা বলে না। যাক্। হাঁ, ভাল কথা,—মালবিকাকে দেবী কিরূপে পেলেন তা কিছু তুমি জান?

বকু। অন্তপাল দুর্গের অধিপতি বীরসেন আমাদের রাণীমার ধর্ম্মভাই। মহারাণীর শিল্প-কার্য্য কর্‌বার জন্য তিনিই মালবিকাকে রাণীমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। এইত আমরা জানি।

গণ। (স্বগতঃ) মালবিকাকে দেখ্‌লে নীচ বংশীয়া বলে আমার মনে হয় না। উল্টে, তাঁকে সর্ব্বদাই আমরা রাজকন্যা বলে ভ্রম হয়ে থাকে। দেখা যাক্ কতদূর কি গড়ায়। (প্রকাশ্যে) ভদ্রে! তুমি দেবীকে ব'লো যে মালবিকাকে শিক্ষাদান ক'রে নাট্যাচার্য্য গণদাস নিজেকে ধন্য মনে করে থাকেন।

বকু। আর্য্য! আপনার শিষ্যা এখন কোথায়?

গণ। আমি তাঁকে এই মাত্র পঞ্চাঙ্ক অভিনয় সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে আস্‌ছি। তিনি খুব সম্ভব এখন বাগানে থাক্‌তে পারেন;

বকু। আর্য্য! আজ্ঞা করুন, সখির সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

গণ। বিলক্ষণ, যাবে বই কি! এই এখান দিয়ে যাও গিয়ে দেখা করে এস। আমিও নিজের কাজ সেরে আসি।

(উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।)

পারলৌকিক প্রসঙ্গ

১—মৃত্যু—শয্যা

জীবিত ও মৃতমনুষ্যের মধ্যে যে দেখা-শুনা হইতে পারে, দৃশ্য ও অদৃশ্য পদার্থের মধ্যে যে একটা সুন্দর সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহলোকে থাকিয়াও—যে পারলৌকি বার্ত্তা অবগত হইতে পারা যায়, তাহা কি আমরা সহজভাবে উপলব্ধি করিতে পারি না? আমাদের আশে পাশে সময়ে সময়ে যে সকল অদ্ভুত ঘটনা সজ্যটিত হয়, বিবিধ সম্বাদ-পত্রে, যে সকল অলৌকিক রহস্য প্রচারিত হয়, তাহা ধীরভাবে আলোচনা করিলে, ইহ-পর-লোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ কি অবিশ্বাস করিতে পারেন? স্থূল দেহ ছাড়িলেও মনুষ্য যে সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া অবস্থান করে তাহা কি

কাহারও অপ্রত্যয় হয়? দেহ ত্যাগের পর মুক্তাত্মা যে পরলোক হইতে ইহলোকে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়া যে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও কি কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে?

যদি, বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন সময়ের অলৌকিক ঘটনাবলীর আলোচনা করিয়া ইহা প্রমাণ করা যায় যে, মানব আত্মা, স্থূলদেহ ত্যাগের পর সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া পরলোকে অবস্থান করে, তাহা হইলে এ জড়জগৎ যে অসার এবং মানবাত্মা যে অবিনাশী ইহাই প্রতিপন্ন হইবে।

মৃত্যুকালে বা মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে, অনেকে মৃত পরিজনের ছায়ামূর্ত্তি অবলোকন করিয়া থাকেন। কেহ বা স্বপ্নযোগে মৃত পরিজনের বিয়োগ বার্ত্তা অবগত হয়েন। কোন কোন স্থানে প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয় ও নানাবিধ অলৌকিক কার্য্য সম্পাদিত হয়। কোথাও বা মুক্তাত্মা জড়দেহে আত্ম-প্রকাশ করিয়া প্রত্যাদেশ করিয়া থাকেন। ইত্যাদি রকমের বহু শত ঘটনা নানা স্থানে ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। এই সকল ঘটনা যে অলীক বা কল্পনা প্রসূত, কিম্বা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের পরিণাম, এমন কথা কেহ বলিতে পারিবে না। কারণ যাঁহারা ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রেত-তত্ত্বে আদৌ বিশ্বাস করিতেন না। যাঁহারা এই সকল বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কৃতবিদ্য ও স্বনামধন্য মহাপুরুষ। সুতরাং তাঁহারা যে অপ্রকৃত কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এমন কথা কি বিশ্বাস হয়? আবার যাঁহারা এ সকল মানেন না, তাঁহারা মুমূর্ষ ব্যক্তির ছায়া-দর্শন ব্যাপার ও প্রেতাধিকৃত নরনারী যে সকল পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহারা ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, পরীক্ষায় তাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া যখন প্রকাশ হইল, তখন তাঁহারা পারলৌকিক জগতে মানবাত্মা যে শরীরে অবস্থান করে এবং অবস্থা বিশেষে যে তাহাদের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারা যায়, এই সরল সত্যটুকু মানিয়া লইয়াছেন।

মৃত্যু শয্যায় শায়িত নরদেহের প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, ইহাই ইহ-পর-লোকের সন্ধিস্থল। আত্মা এক অবস্থার সীমা ছাড়াইয়া আর এক অবিদিত পূর্ব্ব নূতন অবস্থার সীমায় পদার্পণ করিতেছে। সুতরাং এই অবস্থায় মুমূর্ষ ব্যক্তির যে ভাব প্রকাশ পায় বা তাহার পরে যে সকল

উক্তি শুনিতে পাওয়া যায়, বা যে সকল দৃশ্য তাহার নয়নপথে পতিত হয়, তাহার আলোচনা করিলে কি আমরা পারলৌকিক জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারি না ?

পারলৌকিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিত রিচার্ড পাইক সাহেব লিখিয়াছেন, "মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সকল অবয়ব যখন স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন কোন কোন ব্যক্তির মুখে অকস্মাৎ এক অপূর্ব্ব জ্যোতির বিকাশ হইতে দেখা যায়। যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য অবলোকন করিয়া তাহার নেত্র স্থির হইয়া গিয়াছে, যেন কি এক অননুভূত আনন্দের বেগে অভিভূত হইয়া গিয়াছে। এই ভাবে, তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় অতিরিক্ত আনন্দের সন্ধান পাইয়া সে তাহাতেই মজিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু ঘটিল।

মিস্ফ্রান্সিস পাওয়ার কোচ, তৎপ্রণীত, "দি পিক্‌ইম্ ডারিয়েন" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়া মুমূর্ষ ব্যক্তি, যে দৃশ্য অবলোকন করিতে থাকে, আমরা তাহার ভিতর একটু উঁকি দিয়া পর-জগতের চিত্র দেখিয়া লইতে পারি না কি ? যদি মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে এইরূপ বিবেচনা হয় যে, যে মুহূর্ত্তে দেহের ক্রিয়া অবসন্ন হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময়েই আত্মা পারলৌকিক জীবনের পরিচয় পাইয়া থাকে। সেই সময় হইতে সে, আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অতীত সূক্ষ্ম বিষয়ের ধারণা করিতে আরম্ভ করে।"

এই জন্য মৃত্যুকালে বালকদিগের মুখেও সময়ে সময়ে জ্ঞানের বচন শুনিতে পাওয়া যায় মুমুর্ষুর চক্ষে আমাদের দৃষ্টি বহির্ভূত অলৌকিক দৃশ্যের ছায়াপাত হয়! স্যার টমাস ব্রাউন, তদীয় "রিলিজিও মেডিসি" নামক গ্রন্থে লিখিতেছেন —"মৃত্যুকালে কেহ কেহ তাহাদের জ্ঞানাতিরিক্ত বিষয়ের বর্ণনা করিয়া থাকে। এইরূপ হইবার কারণ আত্মা তখন জড়দেহের বন্ধনমুক্ত হইয়া আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে থাকে, মর জগতের জীবদেহে, যে চৈতন্যের সন্ধান পায় নাই, এখন তাহার আভাস পাইতেছে।"

(ক্রমশঃ)

হিন্দু বিবাহের পণ-প্রথা

বর্ত্তমানে হিন্দু-সমাজে বিবাহে পণ-প্রথা যেরূপ বিদ্যমান আছে, তাহা কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র হিন্দুর রক্তশোষণ ব্যতিত আর কিছুই নহে। আমরা প্রায়ই সভা-সমিতিতে ওজস্বিনী ভাষায়

পৈশাচিক পণ-প্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া সভায় সভ্য মহোদয়গণকে ইহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া থাকি, আবার হয়ত স্বীয় পুত্রের বিবাহকালে কন্যার পিতার নিকট প্রচুর পরিমাণে টাকা আদায় করিয়া লওয়া হয়। হইতে পারে কন্যার পিতা ধনশালী, সামর্থ্য থাকায় বরের যৌতুকস্বরূপ অর্থদান ও কন্যাকে প্রচুর পরিমাণে অলঙ্কার দিতে পারেন, তাহাতে কাহারও অবশ্য বাধা দিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কোন দরিদ্র-হিন্দু পরমাসুন্দরী সুশিক্ষিতা কন্যাকে সুপাত্রে দান করিতে পারেন না, ইহাই সমাজের অধঃপতন। একজন দরিদ্র হিন্দু ক্রমাগত ছয় সাতটি কন্যার পিতা হইয়া সমাজের এবম্প্রকার কুপ্রথা পরিদর্শন করিয়া তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তি একেবারে হীন হইয়া পড়ে, পরে ভদ্র-সমাজের 'গুণ্ডা' আখ্যাধারী চরিত্রহীন যুবকদলের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়া অব্যাহতি পান। সমাজের এইরূপ প্রচলনে হিন্দুরা বাস্তবিকই এক অন্ধকার গহ্বরের অনুসরণ করিতেছে।

হিন্দু-সমাজে বিবাহে পণ-প্রথা প্রাচীন-কালেও ছিল, কিন্তু তাহা এরূপ ভাবে নহে। বর পক্ষের দারিদ্র্যপ্রযুক্ত পণ-প্রথার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহাই বর্ত্তমানে কন্যা পক্ষের রক্ত-শোষক সমাজ বিধ্বংসী অস্ত্ররূপে বঙ্গদেশের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সঙ্গতিপন্ন সমকক্ষ ঘর হইলে কন্যার পিতার নিকট হইতে পণ লওয়া যায় তাহাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু কন্যার পিতা অতিশয় দরিদ্র হইলে বিত্তশালী বরের পিতার কোন প্রকারেই পৈশাচিক ভাবে পণ লওয়া উচিত নহে। বরের পিতা ধনী ও পুত্র সুশিক্ষিত হইলে কিছুতেই দরিদ্রের ঘরে সম্বন্ধ স্থাপন করে না, কারণ অর্থ পাওয়া যায় না। দরিদ্র হিন্দু কন্যা পরমাসুন্দরী ও সুশিক্ষিতা হইলে বরের পিতার পৈশাচিক ভাবে অর্থ লালসা পরিত্যাগপূর্ব্বক, শিক্ষিত পুত্রের জন্য উপযুক্তা পুত্রবধূ ঘরে আনিতে হয়, ইহাই সমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য। সমাজে পণ প্রথার পৈশাচিক ব্যবহার বর্ত্তমান থাকায় অনেক স্থলে উপযুক্ত পাত্রীর সহিত মনোমত বরের সম্মিলন হয় না। ইহা হইতে সংসারের প্রায়ই কলহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে সংবাদ-পত্র সমূহ রমণীগণের আত্মহত্যা বার্ত্তা বহন করিয়া থাকে, উহাতে অনেক স্বামীস্ত্রীর মনো-মালিন্য সংঘটিত হইয়া থাকে।

কালচক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী বহু বর্ষ চলিয়া গিয়াছে; আমরা বিংশ-শতাব্দীর মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছি। সঙ্গে

সঙ্গে সমাজের নানাবিধ রীতি নীতির উত্থান ও পতন সংঘটিত হইতেছে। প্রাচীন কালে সমাজের একরূপ বন্ধন ছিল, তাহা প্রত্যেক গৃহস্থের মূল মন্ত্র স্বরূপ ছিল। এইরূপ সামাজিক বন্ধনের দ্বারা কুপ্রচারের উৎপত্তি হইত না। আজ কাল সমাজের একপ্রকার বন্ধন আছে বটে, কিন্তু তাহা ঐরূপ বন্ধন নহে।

উক্ত প্রথানুসারে দরিদ্রকন্যা অতিশয় বয়স্থা হইয়া পড়ে। বরের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ায় যখন দরিদ্রের অরক্ষণীয়া কন্যাগণের যৌবন যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় তখন কোন স্থলে কেহ চরিত্রহীনা হইয়া পড়ে কেহ বা কেরোসীন সিক্ত বস্ত্রাবৃত দেহে অগ্নি সংযোগে সমস্ত যন্ত্রণার অবসান করে ইহা কি সমাজের অকল্যাণকর বিষয় নহে? বাধ্যতা মূলক পণ প্রথা হেতু বিত্তশালী লোকেরও উচ্চস্তর হইতে হীন অবস্থার নিম্নস্তরে নামিয়া আসিতে হয়। সামর্থ্য থাকিলে কন্যা পক্ষের অভিলাষানুসারে পণ দান প্রথা প্রচলন অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ প্রথা বাধ্যতা মূলক না হইয়া সামর্থ্যানুসারে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রতি বৎসরেই ধনবানের গৃহে দুই একজন করিয়া বা ততোধিক কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণের আগমন স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবেই বুঝা যায় বাধ্যতা মূলক পণ প্রথা দ্বারা অন্যান্য হিন্দু অপেক্ষা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়েরই অধিক অধঃপতন হইতেছে এখন একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় এই ঘৃণিত পণ প্রথা কতদূর অধর্ম্ম ও অনিষ্টকর।

সমাজের এই প্রতিকূল বেগকে ফিরাইতে না পারিলে সমাজের অঙ্গে এই বিষম ব্যাধির প্রসার রোধ করিতে না পারিলে ক্রমশঃ ভীষণ ধ্বংসরূপী হইয়া দাঁড়াইবে। হিন্দু সমাজ শিক্ষিত ধর্ম্মপ্রাণ ইহার সংশোধনের নিমিত্ত অগ্রসর হউন। কর্ম্মী প্রাণের অভাব নাই কিন্তু কর্ম্মের প্রয়োজন।

কোহিনুর বা ভারতভাগ্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীগিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এএম. ডি লিখিত

হুইটেকার বলেন যে আরঙ্গজেব ময়ূর সিংহাসনের ময়ূরের একটী আঁখি কোহিনুর হীরকে ও অপর আঁখি কোহিনুর নামক হীরকে গঠিত করেন। নাদির সাহ এই সিংহাসন

পারস্যে লইয়া গিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন ও কোহিনুর অধিকারী হয়েন। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনা পাঠে জানা যায় যে বিজয়ী নাদির সাহ দিল্লীশ্বর মহম্মদ সাহর নিকট হইতে কোহিনুর কৌশলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। দিল্লীর রাজকোষ লুণ্ঠন করিয়া নাদির সাহ কোহিনুর না পাইয়া বড় দুঃখিন হন। পরে দিল্লীশ্বরের অন্তঃপুরচারিণীর কোন কামিনীর নিকট এই সংবাদ পাইলেন যে মহম্মদ সাহ নিজ শিরস্ত্রাণ মধ্যে জগদ্বিখ্যাত মোগলের হীরক লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। কিন্তু নাদির সাহ তাহাও কৌশল ক্রমে হস্তগত করেন। রাজকোষের সমস্ত ধনরত্ন অধিকার করিয়া নাদির সাহ দিল্লীশ্বরের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। সুতরাং এই হীরকের জন্য পুনরায় দিল্লীশ্বরের উপর বল প্রয়োগ করিবার কোন ছল পাইলেন না। নাদির সাহ দিল্লী নগরীতে এক প্রকাশ্য দরবার করিলেন। নাদির সাহ ও দিল্লীশ্বর পরস্পর প্রীতি সম্ভাষণ করিলেন ও বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ নাদির সাহ মহম্মদ সাহকে দিল্লীর সিংহাসনে পুনরায় স্থাপিত করিলেন। নাদির সাহ চির প্রচলিত নীতি অনুসারে—দিল্লীশ্বরকে শিরস্ত্রাণ আদান প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। মহম্মদ সাহ একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। কি করিবেন ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কূটবুদ্ধি নাদির সাহ তাঁহাকে আর চিন্তা করিবার মুহূর্ত্তও অবসর দিলেন না। বহু রত্ন খচিত নিজ উষ্ণীষ দিল্লীশ্বরের হস্তে প্রদান করিলেন। অগত্যা দিল্লীশ্বর নিজ শিরস্ত্রাণ গম্ভীর ভাবে নাদির সাহের হস্তে অর্পণ করিলেন। তাঁহার বদনে কোন বিষাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। ইহাতে নাদির সাহের অন্তঃকরণে দারুণ সন্দেহ জন্মিল। সন্দেহ নিবারণ করিবার জন্য তিনি শীঘ্রই দরবার শেষ করিয়া দিলেন। নিজ তাঁবুতে উপস্থিত হইয়া দিল্লীশ্বরের শিরস্ত্রাণ খুলিয়া ফেলিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে নাদির বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তাঁহার রত্ন পিপাসা প্রশমিত হইল। সেই বিখ্যাত হীরক সন্দর্শন করিয়া তিনি আনন্দে কো-হি-নু-র এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন। (কো = পর্ব্বত, নুর = জ্যোতি) কোহিনুর শব্দের অর্থ আলোক পর্ব্বত। সেই অবধি ঐ হীরক কোহিনুর নামে পরিচিত হইয়াছে।

দিল্লী নগরী লুণ্ঠন করিয়া, নাদির সাহ, কোহিনুর বিজিত, বহু মূল্যবান হীরক ও অর্থ প্রাপ্ত হয়েন। তিনি যে সম্পত্তি অধিকার করেন তাহার মূল্য অনুমান করিয়া কেহ বা ১০,০০০,

••• পাউণ্ড। কেহ বা ৮০,০০০০০০ পাউণ্ড এবং অপরে ৩২,০০০,০০০ পাউণ্ড (Imperial Gazetteer vol vi. P. 314) স্থিরীকৃত করে। খারস্যে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক, একদিন ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, তিনি নিজ পুত্র রিজা কোলী মির্জার চক্ষু উৎপাটন করিয়া দেন। তাঁহার নানারূপ অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া জনসাধারণ পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে খোরাসন অন্তর্গত ফিলাট নগরে এক গুপ্ত ঘাতকের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, রিজা কোলী মির্জার পুত্র সাহরুখ মির্জা পিতামহের সিংহাসন অধিকার করেন এবং কোহিনুর তাঁহার অধিকারে আইসে। ১৭৪৭ খৃ অঃ এই লুণ্ঠিত সম্পত্তির মূল্য সাধারণতঃ ৩২০,০০০,০০০ টাকা বলিয়া বিশ্বাস। অনেকে কিন্তু ইহার মূল্য আরও অধিক বিবেচনা করেন—তাঁহাদের হিসাবে ইহার মূল্য ১,২৫০,০০০,০০০ টাকা।

(India Ancient and Modern. By) D. Allen P. 145. 1856.)

আরঙ্গজেবের পৌত্র, কামবক্সের পুত্র আজীজ উদ্দীনের কন্যাসহ নিজ পুত্র নসরুল্লার বিবাহ প্রদান করেন। এবং তদুপলক্ষে বহু অর্থ ব্যয়ে ভোজ, নৃত্যগীত, তাকসী, বাজী ও আলোক মালায় দিল্লী নগরীতে আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। নাদীর সাহ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত দ্রব্যের একটী তালিকা ফ্রেজার সাহেব প্রদান করেন। সম্রাট ও ওমরাহদিগের নিকট হইতে মণিমুক্তাদি মূল্য হিসাবে ৭০ ক্রোর টাকা, তাঁহার সৈন্যবর্গ ও কর্ম্মচারীগণ ১০ ক্রোর টাকা লইয়া যায় এবং ভারতবর্ষে তাঁহার সৈন্যদিগের ব্যয় বাবদ, ২০ ক্রোর টাকা ব্যয় করেন। এতদ্ব্যতীত ১০০০ হস্তী, ৭০০০ অশ্ব, ১০,০০ উষ্ট্র, ১০০ জন নপুংসক, ১৩০ জন হিসাব রক্ষক, ২০০ কর্ম্মকার, ৩০০ রাজমিস্ত্রি ১০০ প্রস্তর খোদক ও ২০০ কাঠের মিস্ত্রি লইয়া যান।

আহম্মদ সাহা অবদালী নাদির সাহের অধীনে আফগানদিগের সেনাপতিরূপে কার্য্য করিতেন। নাদিরের মৃত্যুর পর আহম্মদ-সাহ রাজকীয় কোষাধ্যক্ষ পদে অবস্থিতি করেন। রাজকোষের ধনসম্পত্তি সিন্ধুকে পূরিয়া নিজ সৈন্য-সহ তিনি কন্দাহার যাত্রা করেন। পথে তুরিখী খাঁর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তুরিখী খাঁ, নাদির সাহের অধিকৃত কন্দাহার, কাবুল, টাটা, টক্কর, মুলতান ও পেশওয়ার রাজ্যের খাজনা লইয়া আসিতেছেন। আহম্মদ সাহ তাঁহাকে নাদির-সাহের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তুরিখীখাঁ

সংগৃহীত কর ও সিন্ধুকস্থিত ধনসম্পত্তির সাহায্যে আহম্মদ-সাহ উপরোক্ত পঞ্চপ্রদেশ একত্র করিয়া স্বাধীন আফগাণ রাজ্য স্থাপন করিলেন। এই আফগাণরাজ্য হইতে তিনি মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষ ও খোরাসান আক্রমণ করিতেন।

পারস্যে অন্তর্বিদ্রোহ আবন্ত হইল। সাহরুখ বিদ্রোহীগণ কর্তৃক চক্ষু দুইটী হারাইলেন। সাহরুখ কোহিনূর অধিকারী হইয়া একদিনের জন্য সুখী হইতে পারেন নাই। এই হীরক রক্ষা করিতে তাঁহাকে যেরূপ অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা ইতিহাসে বিরল। সিংহাসন চ্যুত হইয়া তিনি মেষদ (meeshd) জেলার শাসকরূপে মেষদ্ সহরে বাস করিতেছিলেন। এইস্থানে তিনি, নাদির কর্তৃক ভারতবর্ষ হইতে আনীত কোহিনূর ও অন্যান্য বহুমূল্য হীরক লুক্কায়িত রাখিয়া রক্ষা করেন। সিংহাসন প্রাপ্তির অল্পকাল পরেই সাহরুখ, আগামহম্মদ নামক একজন প্রধান অমাত্য কর্তৃক পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ হয়েন। কিন্তু দুর্বৃত্ত আগা মহম্মদ (মীর আলম খাঁ) তাহার এরূপ হীনাবস্থায় ও সন্তোষ লাভ করিতে পারিল না। ক্রমশঃ—

বর্ষারম্ভে প্রশ্ন

ভগবানকে ছাড়, সুখী হইবে

(শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এল্)

ভগবানকে, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য ছাড়িয়া দেখ, তুমি কত সুখী হইবে, এই কথা আজকাল অনেক লোক বলে।

ধর্ম্ম ধর্ম্ম কোরেই মানুষ উচ্ছন্ন যায়। যে যত ধার্ম্মিক হয়, তাহার ততই সাংসারিক কষ্ট। যেখানে যত পূজা, পাঠ, ভগবানে ভক্তি, সৎকথা, পাপে ভয়, ভগবানের নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন, সেইখানেই তত দারিদ্র্য দুঃখ ও বিপদ। যে ব্যক্তি যত সৎভাবে থাকিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই ব্যক্তিই তত বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং ভগবানকে ধরিয়া সংসার করিলে মানুষের দুর্গতির চুড়ান্ত হইবে।—এই কথাই আজকাল চারিদিকে শোনা যায়।

পক্ষান্তরে দেখা যায় ও শোনা যায়, যে ব্যক্তি যত অন্যায় কার্য্য করিতেছে, অনাচার অভক্ষ্য ভোজন, প্রকাশ্য ব্যভিচার, মিথ্যাচরণ করিতেছে,

অসৎ উপায়ে নানা কৌশলে পরের সর্ব্বনাশ করিয়া, অর্থ উপায় করিতেছে, সেই ব্যক্তিই সংসারে ধনী, মানী ও সুখী হইতেছে।

এমন যে ভগবান সর্ব্বশক্তিমান, তিনি যদি তাঁহার আশ্রিত ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে দরিদ্র, দুঃখী, বিপন্ন ও শ্রীহীন করেন, তবে বুদ্ধিমান লোকমাত্রেই সেই ভগবান হইতে দূরে থাকিবে। ভগবানকে ছাড়িলেই যদি সুখী হওয়া যায় তবে সকলেরই ভগবানকে ছাড়িতে প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত।

এমন দেখা যাক্ কোন্ কথাটা সত্য।

ভগবানকে ছাড়িয়া কাহার আশ্রয় লইব ?— ইহার উত্তরে আধুনিক পণ্ডিত বলেন, কলির প্রজা হও সংসারে সকল সুখে সুখী হইবে।

কলির প্রজা হইলে কলির ভাণ্ডারের সার রত্ন পাওয়া যায়। সেই সার রত্ন কি ? তাহা —অর্থ, মান, প্রভুত্ব ইত্যাদি। এই গুলিকে শাস্ত্রে অবিদ্যার সম্পত্তি বলে। ইহাতে সংসারের অনেক সুবিধা হয়' কিন্তু মনের শান্তি পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ধনবান ব্যক্তিকে বুকে হাত দিয়া বলিতে বল, সে সুখী কি না। দেখিবে প্রায় সকলেই বলিবে সে মহাদুঃখী, মনের শান্তি কাহাকে বলে সে জানে না। সে অর্থের বিনিময়ে কুলিদের মনের শান্তি চায়।

ভগবানের শরণাগত প্রজা হইলে তাঁহারা ভাণ্ডারের সার রত্ন পাওয়া যায়। সেই সার রত্ন কি ? তাহা—জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি মুক্তির ইচ্ছা ইত্যাদি। এগুলিকে শাস্ত্রে বিদ্যার সম্পত্তি বলে।

কলির প্রজারা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করে না। যে কোন উপায়ে হউক, অর্থ উপায় করিতে হইবে, এই তাহাদের লক্ষ্য। তাহারা অর্থের উপাসনা করে, পরমার্থ ছাড়িয়া দেয়। অর্থের যতটা ক্ষমতা আছে, ততটা সুবিধা তাহারা পায়। সংসারের তাপ, জ্বালা, শোক, মোহ এড়াইতে তাহারা পারে না।

ভগবানের প্রজারা অর্থাৎ ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা অর্থ ছাড়িয়া পরমার্থ লক্ষ্য করে। তাহারা অস্থায়ী সুখ, শান্তি চায় না। তাহারা চায় স্থায়ী সুখ শান্তি, পরমার্থ চিন্তা। যাহাতে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়া কালে সংসার হইতে মুক্তিলাভ করা যায় ইহাই তাহারা কামনা করে। নির্ম্মল ভাবরাজ্যে থাকে বলিয়া দুঃখ দরিদ্র্যের মধ্যে শত সাংসারিক অশান্তির মধ্যেও তাহারা শান্তি পায়, সেইজন্য দুঃখ সহ্য করিবার শক্তি ও মনের বল পায়।

সকলেই যখন বলিতেছে যে অন্ততঃ দুই বৎসরের জন্যও ভগবানের উপাসনা ও চিন্তা

ছাড়িয়া দেখ তোমার সৌভাগ্য কিরূপ হয়, তখন বন্ধুদের কথায় কালাপাহাড় হইয়া দেখিতে পার। কিন্তু মনে রাখিও তুমি অমর নও। মৃত্যুর সময় ও পরে একজনের আশ্রয় আবশ্যক। ভগবানকে ছাড়িয়া দিলে তখন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি আশ্রয়দাতা হইতে পারে?

এখন খুব ধীরভাবে বিচার কর, ভগবানকে ছাড়া যায় কি? তুমি কে? সেই ভগবানের প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্ব কি বিম্বকে ছাড়িতে পারে? ছাড়া সম্ভব কি? কেবল অজ্ঞানে তুমি ভগবানকে ভিন্ন জিনিষ মনে করিতেছ। জ্ঞানে যখন সিদ্ধান্ত হইয়া রহিয়াছে যে তুমিই সেই সচ্চিদানন্দ, তখন, তোমার স্বরূপকে ছাড়িবে কেমন করিয়া? ভগবানকে ছাড়া যায় না বলিয়াই তুমি ছাড়িতে পারিবে না।

এখন সুখী দুঃখী হওয়ার কথা? কর্ম্মফলের ব্যবস্থা আছে মানিলেই গোল মিটিয়া যায়।

সকল দিক্ ভাবিয়া, এখন বর্ষপ্রবেশে বন্ধুদের কথায় বিচার করিয়া দেখ—কলির প্রজা হইয়া ভগবানকে ছাড়িয়া থাকিবে কি?

লক্ষ্মী যাঁর পদসেবা করিয়া ধন্য হয়, সেই ভগবানকে ধরিলে, মানুষ দরিদ্র ও বিপন্ন হয়, এই ভয়ানক বিশ্বাস কোন্ পাপে আজ আমাদের মনে স্থান পাইতেছে।

হায়, ভগবান্ ভিন্ন এ আসুরিক ভাব নষ্ট করিতে আর কেহই পারিবে না। উৎসব।

উপাধি লাভ—

হাওড়া রাউতাড়া নিবাসী দানশীল দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ জমিদার—স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধোপলক্ষে হাওড়া ও হুগলী জেলার বহু গৌড়-দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভিন্ন ভিন্ন সমাজের খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণ আহূত হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে একটী ব্রাহ্মণ-সভার অধিবেশন হয়। ঝিঁখিরানিবাসী ডাঃ শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় ও ঝিঁখিরা হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীহরিপদ সরখেল মহাশয়দ্বয়ের প্রস্তাবানুসারে উক্ত স্কুলের প্রধান অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, সাহিত্যভূষণ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয়ের গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায়, সভার সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। হাওড়া, বাটাননিবাসী শ্রীকাঙ্গালীচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ ও

গোন্ডলপাড়ানিবাসী পণ্ডিত অন্নদাপ্রসাদ চূড়ামণি মহাশয়গণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। হাওড়া, পাঁচারুলনিবাসী শ্রীহারাধন কাব্যনিধি কথক চূড়ামণি মহাশয়ের প্রস্তাব ও ঝিঁখিরা হাইস্কুলের হেডপণ্ডিত কাব্যব্যাকরণ-তীর্থ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সমর্থন অনুসারে, হাওড়া, কাসুন্দিয়া-হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব কমিশনার, গ্রামনিবাসী, মাহিষ্য ও তদীয় যাজক ব্রাহ্মণ-সমাজ-সংস্কারক স্বার্থত্যাগী ডাঃ শ্রীঅক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে "সিদ্ধান্তভূষণ" উপাধি প্রদানে ভূষিত করিয়াছেন। আমরা শ্রদ্ধেয় ডাঃ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। উপাধি পত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীশ্রীহরি—শরণং।

"সরস্বতী শ্রুতি মহতী ন হীয়তাং।"

রাউতাড়নিবাসী জমিদার—স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায় মহোদয়স্য শ্রাদ্ধবাসরে।

হাওড়াপ্রদেশান্তর্গত কাসুন্দিয়াগ্রামনিবাসিনে বর্ণাশ্রমধর্ম্মরক্ষার্থং অক্লান্তকর্ম্মণে শ্রীমতে অক্ষয়-কুমার চক্রবর্ত্তিণে মাহিষ্যসমাজসংস্কারকসম্মিলিত সভাতঃ "সিদ্ধান্তভূষণ" ইত্যুপাধি প্রদত্তঃ। তদয়ং নিখিল ধর্ম্মশাস্ত্রচর্চ্চায়া ধর্ম্মেণ বর্দ্ধতা মায়ুষ্মান্।

সভাপতিনা—

বি এ, সাহিত্যভূষণ বিদ্যাবিনোদ ইত্যু-পাধিধারিণা শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েন, আলিপুর কলিকাতাবাসীনা।

সভ্যবৃন্দৈশ্চ—

কাব্যব্যাকরণতীর্থ বিদ্যার্ণবোপাধিকেন শ্রীবসন্তকুমার দেবশর্ম্মণা। ফরিদপুর, খাটরা-বাসিনা। কাব্যতীর্থ-উপাধিকেন ঝিঁখিরা-নিবাসিনা শ্রীরামাজ দেবশর্ম্মণা। স্মৃতিরত্নো-পাধিক শ্রীনিত্যতারণ দেবশর্ম্মণা। সাঙ্খ্য-বেদান্ততীর্থ উপাধিক শ্রীকাঙ্গালীচরণ দেবশর্ম্মণা। শ্রীহারাধন কাব্যনিধি, সাং পাঁচারুল। শ্রীব্রহ্ম-মোহন ভট্টাচার্য্য, সাং জয়পুর। শ্রীঅধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সাং জয়পুর। শ্রীনীলকমল বিদ্যারত্ন, সাং পুটখালি। শ্রীভবতারণ পদরত্ন সাং আকনা। বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীঅশ্বিনীকুমার দেবশর্ম্মণা, সাং রাজপ্রতাপ। কাব্যরত্নোপাধিক শ্রীমণি-মোহন দেবশর্ম্মণা, সাং তাজপুর। কাব্যরত্নো-পাধিক শ্রীভূষণচন্দ্র দেবশর্ম্মণা, সাং তাজপুর। শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, সাং কুমারে। শ্রীবিভূতি ভূষণ চক্রবর্ত্তী, সাং মৈনান, হাওড়া। শ্রীবসন্ত-কুমার দেবশর্ম্মণা, সাং খোড়িয়প। শ্রীভুবনমোহন দেবশর্ম্মণঃ, খালনা। শ্রীমাখনলাল কাব্যতীর্থ, খালনা। শ্রীহরিপদ দেবশর্ম্মণঃ, মুখোপাধ্যায়, সাং বিধিচন্দ্রপুর। ফুলেশ্বরনিবাসিনা কাব্যতীর্থ উপাধিক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণা। কাব্যরত্নো-পাধিক শ্রীরাধাকান্ত দেবশর্ম্মণা, সাং কাসুন্দিয়া হাওড়া। ভাগবতভূষণ-উপাধিক শ্রীমতিলাল দেবশর্ম্মণা ও শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য দেবশর্ম্মণা, সাং অনন্তরামপুর।

কর্ম্মযোগ পুস্তক ভাণ্ডার।

আমাদিগের এই পুস্তক-ভাণ্ডার হইতে যে সকল অমূল্য গ্রন্থরাশি প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতেছে এবং বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ—

সাধক শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

অন্যান্য গ্রন্থ।

১। **আদর্শ ব্রাহ্মণ**—ভক্তি-রসাত্মক নাটক—বহু নাট্য সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনীত হইতেছে। মূল্য ১৲ টাকা।

২। **মায়েরখেলা**—ভক্ত-হৃদয়ের পবিত্র উচ্ছ্বাস—মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

৩। **মা আমার কাল' কেন?**—মাতৃরূপের-ব্যাখ্যা-বিবৃতি—মূল্য ৷৵০

৪। **শিবের বুকে শ্যামা কেন?**—প্রশ্নের সারসিদ্ধান্ত—মূল্য ।৵০

৫। **বিজয় ভেরী**—ধর্ম্ম-বিষয়ক সিদ্ধান্ত—মূল্য ⁄১০ দেড় আনা।

৬। **মুক্তি**—মূল্য ৵০ আনা।

৭। **সত্যালোকম্**—৵০ আনা।

৮। **শোকশান্তি**—।০ আনা।

শ্রীমৎ বিষ্ণুপুরী গোস্বামী বিরচিত ও শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল কর্ত্তৃক পদ্যানুবাদ।

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলী—ভক্তি-রসাত্মক উপাদেয় গ্রন্থ। আইভরি কাগজে ৩২০ পৃষ্ঠা আবাঁধা মূল্য—১৲ টাকা।

রামলীলা—উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত ভক্তিমূলক গ্রন্থ। মূল্য ৷৷০ আনা।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

১। **রাজবান্ধিনী** বা বঙ্গবীরাঙ্গনা—ব্রাহ্মণ রাজকন্যার অলৌকিক বীরত্ব-কাহিনী—সত্যঘটনা—মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

২। **বঙ্গবীর রণজিৎ রায়**—অপূর্ব্ব বীরত্ব-কাহিনী ইতিহাসের জীবন্ত চিত্র—১।০ পাঁচ সিকা।

৩। **অভিরাম গোস্বামী**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক ঘটনাবলি পূর্ণ ভক্তিমূলক—মূল্য ১৷৷০ টাকা।

বঙ্গবিখ্যাত দার্শনিক

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন প্রণীত

১। **গীতায় ঈশ্বরবাদ**—১।০

২। **উপনিষদ ব্রাহ্মণ**—১।০

হীরেন্দ্র বাবুর বহু গবেষণা ও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ গ্রন্থ—ধর্ম্মতত্ত্বের নিগূঢ় তত্ত্বের বিশদভাবে বিশ্লেষণ—যিনি না পড়িয়াছেন, তাহার জীবনই বৃথা।

• • • • •

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মূল—চণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সাধনসমর বা দেবী-মাহাত্ম্য—"ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ" নামে প্রকাশিত—২৭৭ পৃষ্ঠা মূল্য ২৲ টাকা।

ঐ ঐ—২য় খণ্ড "বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ" নামে প্রকটিত—৩৭২ পৃষ্ঠা—মূল্য ২৲ টাকা।

ঐ ঐ ৩য় খণ্ড "শুম্ভ-বধ—রুদ্রগ্রন্থি ভেদ" মূল্য ২৲ টাকা।

সত্য প্রতিষ্ঠা—মূল্য ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—কর্ম্মযোগ প্রেস, ৪ নং তেলকলঘাট রোড হাওড়া।

কর্ম্মযোগ পুস্তক-ভাণ্ডার

ভূতপূর্ব্ব "অনুসন্ধান" পত্রিকার অন্যতম পরিচালক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক "আলোচনার" লেখক

শ্রীযুক্ত মোহিতগোপাল লাহিড়ী.

প্রণীত

১। কুললক্ষ্মী—

স্ত্রীপাঠ্য গার্হস্থ্য উপন্যাস। মনোজ্ঞ বাঁধাই, মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। লোকারণ্য—

সংসার অরণ্যের নিখুঁত চরিত্র-চিত্র। মনোজ্ঞ বাঁধাই—মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

৩। বঙ্গলক্ষ্মী—

আধুনিক বাঙ্গালার জাগরণের চিত্র। বৃহৎ উপন্যাস—(যন্ত্রস্থ)।

হাওড়া কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সোম বি-এল্

কর্ত্তৃক বঙ্গ-ভাষায় অনূদিত অত্যাবশ্যকীয় আইন পুস্তক—

ডিক্রিজারি সংক্রান্ত আইন—মূল্য ॥০ আনা
কোর্ট-ফি সংক্রান্ত আইন—মূল্য ৵০ আনা
নূতন ষ্ট্যাম্প আইন—মূল্য ।০ আনা।

উপন্যাসাচার্য্য—
ঋষিকল্প প্রবীণ-লেখক

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

অপরাপর অমূল্য গ্রন্থরাজী

রামপ্রসাদ—	২৲
তুলসী দাস—	৩৲
দরাফ খাঁ—	১॥০
বর্ণাশ্রম—	২৲
সংসার চক্র—	২৲
উপন্যাস গ্রন্থাবলী—	২৸০
মোহন মালা—	১॥০
মায়ার মেলা—	১॥০
পঞ্চরত্ন—	১॥০
নষ্ট চরিত্র—	১৸০

স্তোত্র রত্নমালা

পণ্ডিত শ্রীসারদাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ সঙ্কলিত ও অনূদিত।

১। দেবদেবীগণের স্তব বিশেষতঃ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কৃত স্তব-সমূহ এবং তাহাদিগের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ সহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্তোত্র পুস্তক। ইহাতে শিব মহিম্ন স্তব, বিষ্ণুসহস্র নাম, আদিত্য হৃদয়, আনন্দলহরী, রুচিস্তোত্র, পুরুষসূক্ত স্তব প্রভৃতি অপূর্ব্ব স্তোত্র এবং সে সকলের অবিকৃত বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। সর্ব্ব নর নারীর পাঠ্য মূল্য ১।০।

২। শিবপূজা বিধি।
মহিম্নঃ স্তব, মূল, অন্বয় টীকা, গদ্য অনুবাদ পদ্যানুবাদ সহ। মূল্য ।৶০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—কর্ম্মযোগ প্রেস, ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

হাওড়া—৪নং তেলকলঘাট রোড, "কর্ম্মযোগ প্রেস" হইতে শ্রীযুগলকিশোর সিংহ

দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Alochona Patrika. Registered No. C. 116.

ষষ্ঠাবিংশ বর্ষ।] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ সাল। [দ্বিতীয় সংখ্যা।

পুজনীয় শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রতিষ্ঠিত

আলোচনা

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২৷৵০ আনা।

সূচীপত্র।

বিজ্ঞাপন।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ এক শত আট টাকা, এক ডজনের মূল্য ৯॥০ সাড়ে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা রহিল।

ক বরাজ—উপেন্দ্রনাথ সেন।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।

২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আলোচনা পত্রিকার নিয়মাবলী।

আলোচনার বার্ষিক মূল্য সহর মফস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ২৷৵০ আনা। সাধারণ সমিতি বা পাঠাগার হইতে ✓১০ অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ আবেদন করিলে নমুনা প্রদত্ত হইবে। বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ।

বিজ্ঞাপন দেওয়ার নিয়ম—মাসিক একপৃষ্ঠা বা দুই কলম—৮৲, অর্দ্ধপৃষ্ঠা বা এক কলম ৪৷০, সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম—২৷০ সিকি কলম—২৲।

কভারের পৃষ্ঠার জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম। ছয় মাস বা তদূর্দ্ধ কালের জন্য বিজ্ঞাপনে স্বতন্ত্র চুক্তির দর দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। চুক্তির বিজ্ঞাপন তিন মাসের মধ্যে পরিবর্ত্তন করা হয় না।

আলোচনার জন্য বিনিময় পত্রিকা ও প্রবন্ধাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে। অন্যান্য চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই আমার নামে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ,

কর্ম্মযোগ প্রেস, ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

(ফোন নং ১৯১ হাওড়া)

সত্যাগ্রহ

(শ্রীহরিদাস বন্দোপাধ্যায় এফ্, টী, এস্)

(১)

পিশাচের লীলা হের দেব ধামে,
হ'য়ে ব্রহ্মচারী মত্ত হ'ল কামে,
ব্রাহ্মণ তনয়া হরিমতি নামে—
কেমনে পাষণ্ড মজালে তায়!
দেবের সম্পত্তি করিয়া হরণ,
রচিল সুরম্য বিলাস ভবন,
প্রচারিল শেষে বলিয়া আপন,
এহেন কামুক দেখা না যায়।

(২)

দেবতার ধামে নারী নির্য্যাতন,
বিচলিত তাই যত হিন্দুগণ,
রাজকর্ম্মচারি ঘটালে এমন,
বুঝেও তারা না বুঝিতে চায়।
ভিক্টোরিয়া-বাণী না ক'রে স্মরণ—
প্রতিশ্রুতি তাঁর করিল খণ্ডন,
দিল না দেখিতে লক্ষ্মী নারায়ণ,
ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিল হায়!

(৩)

ঘুমা'য়োনা আর ভারত সন্তান,
নর-নারী মিলে কর যোগদান,
উদ্ধারিতে হবে দেবতার স্থান,
"সত্যাগ্রহ মন্ত্রে" দীক্ষিত হও।
যতদিন রহে অন্তরের বল,
ধমণীতে রক্ত হয় চলাচল,
ভুলনাক "মন্ত্র", হইবে সফল,
তারকনাথের স্মরণ লও।

(৪)

বন্দী হ'য়ে সবে যাও কারাগারে,
নীরস্ত্র, "অহিংসা" শিখাও সবারে,
দেখুগ জগত, আজ অকাতরে—
করিছে সবাই জীবন পণ।
দ্বারে-দ্বারে গিয়া ভিক্ষা কর ভাই,
সুষুপ্ত ভারতে জাগাও সবাই,
সাধিতে একাজ বহু লোক চাই,
মহাব্রতে আজি দাও হে মন।

(৫)

কিনা হ'তে পারে সাধনার বলে!
গিরীশৃঙ্গ তুলে পাড়গে ভূতলে,
প্রাণ দিতে হয় দাও কৌতুহলে,
উদ্ধারিতে আজি দেবের ধন।

"সত্যাগ্রহ মন্ত্র" শয়নে স্বপনে,
"নীরস্ত্র", "অহিংসা" দুটী কথা মনে—
থাকে যেন ভাই—রাখিও স্মরণে,
নিশ্চিত জিনিবে ধর্ম্মের রণ।

বিচার

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ)

নিজের অন্তঃকরণ অনুযায়ী সরস্বতী দেবী পুত্রকে মানুষ করিয়াছিলেন। মাতার ন্যায় পুত্রেরও মনের তেজ ছিল, সঙ্কল্পে দৃঢ়তা ছিল, হৃদয়ে উদারতা ছিল। চাকুরী যাইবার পর প্রথমটা সে দমিয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু মাতার উপদেশে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া শীঘ্রই সে সংকল্প স্থির করিয়া ফেলিল। নিজেই সে একদিন জননীকে বলিল,—"মা চাকুরী করে কি হবে? ব্যবসা কল্লে হয়না?"

পুত্রের মুখে এই কথা শুনিয়া জননীর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনিও কয়দিন হইতে ঠিক এ কথাই ভাবিতেছিলেন। কিন্তু অর্থহীন এবং সহায়হীন অবস্থায় আজকালকার দিনে ব্যবসা করা যে কত কঠিন এবং কষ্টসাধ্য তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। পুত্রের কি অত কষ্ট সহ্য হইবে, শুধু এইটুকুই ভাবিয়া সুরেনকে তিনি কিছুই বলেন নাই, যদিও তিনি জানিতেন তাঁহার পুত্র কি ছিল কি হইয়াছে। সে এক পা কখন হাঁটিতে পারিত না, আজকাল তাঁহার হাঁটা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই। কখন ময়লা কিংবা মোটা কাপড় সে পরে নাই। কখন তালী দেওয়া জুতা সে ব্যবহার করে নাই, কিন্তু আজকাল ছেঁড়া কাপড় এবং ছেঁড়া জুতাই তাহার যথেষ্ট। জননী যখন পুত্রকে এইরূপ বেশে দেখিতেন তাঁহার চক্ষু কাটিয়া জল আসিত, সমস্ত হৃদয় তাঁহার বিষাদে ভরিয়া যাইত। পুত্রের অজ্ঞাতে শুধু চক্ষুজল ফেলিতেন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন।

এ অবস্থায় ব্যবসা করা যে আরো কষ্টকর জননী তাহা বুঝিতেন। কিন্তু এ ছাড়া অন্য-

সংস্থানের স্বাধীন উপায়ও আর যে ছিল না ইহাও তিনি জানিতেন। তাই পুত্রের মুখে ব্যবসার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"আমিও তাই তোকে বল্‌ব মনে কচ্ছিলুম বাবা। কিন্তু অত কষ্ট কি তুই সহ্য কত্তে পারবি?" একটু হাঁসিয়া সুরেন বলিল,—"তোমার পায়ের ধুলা মাথায় নিয়ে আমি সব কত্তে পারি মা। তোমার আশীর্ব্বাদই যে আমার যথেষ্ট।"

"সমস্ত দিন প্রায় না খেয়ে না দেয়ে রোদে রোদে জলে জলে পথে পথে ঘুর্‌তে পার্‌বি? কষ্ট হবে না?" কষ্ট! মা, তুমিই তো দেখতে পাচ্চ কি ছিলাম কি হয়েছি। নিজের অন্ন-সংস্থানের জন্য নিজে চেষ্টা কর্‌বো এতে আর কষ্ট কি মা? শুধু তুমি আমার পাশে থেকে দেখ আমি কি কত্তে পারি।'

আনন্দাশ্রুতে জননীর উভয় চক্ষু ভরিয়া গেল। পুত্রোচিত কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিল।

কিন্তু মুখে অনেক কথা বলিলেও প্রথমটা সুরেনকে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। অর্থ নাই যে খুব একটা বড় ব্যবসা করে। সুতরাং মাতার উপদেশ মত তাহাদের বাড়ীর সামনে যে ছোট ঘরটুকু ছিল তাহারই খানিকটা লইয়া সে একটী ছোটখাট মনোহারী দোকান খুলিল।

সরস্বতী দেবী নিজে শেলায়ের কাজ জানিতেন এবং তাঁতের কাজও জানিতেন। দিবা-রাত্র পরিশ্রম করিয়া তিনি অনেক রুমাল গেঞ্জি প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া সেই দোকানে বিক্রয়ার্থ রাখিতেন এবং অনেক সময় পুত্রকে দিয়া বাড়ী বাড়ীও পাঠাইয়া দিতেন।

প্রথম প্রথম সুরেনের অত্যন্ত লজ্জা করিত, পথে চলিতে তাহার বাধ বাধ ঠেকিত। পাছে কোন পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হয় বলিয়া যতদূর সম্ভব সাবধানে চলাফেরা করিত। কিন্তু জননীর উৎসাহে মৃদু-ভৎসার করুণ অনুরোধে ক্রমে সুরেনের অনেকটা সহ্য হইয়া আসিল।

৩।

হৃদয় হইতে আর সমস্ত সঙ্কোচ দূর করিয়া ফেলিলেও, একটি সঙ্কোচের হাত হইতে সুরেন কিছুতেই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিল না। এ কার্য্য আরম্ভ করিবার পর হইতে সে আর পূর্ব্বেকার মত লক্ষ্মীর সহিত মেলামেশা করিতে পারিল না। তাহার এ ব্যবসায়ে অক্ষয় বাবুর সম্পূর্ণ মত থাকিলেও, লক্ষ্মীর নিকট হইতে সে তেমন উৎসাহ পায় নাই। সে যেদিন লক্ষ্মীকে নূতন উদ্যমের কথা জানাইল, আশা করিয়াছিল লক্ষ্মী কতই আনন্দিত হইবে এবং তাহাকে কতই উৎসাহ দিবে। কিন্তু লক্ষ্মী সে সব কিছুই

না করিয়া শুধু বলিয়াছিল তা, বেশ। উত্তর শুনিয়া সুরেন অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছিল এবং তাহার কার্য্যে লক্ষ্মীর মত নাই এই সিদ্ধান্তই তাহার বদ্ধমুল হইয়াছিল।

সুতরাং যেরূপ উৎসাহ লইয়া এ কার্য্যে সে প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছিল সে উৎসাহ তাহার বেশীদিন রহিল না। উপরন্তু অর্থাভাব এবং অনভিজ্ঞতার দরুণ এ কার্য্যে তেমন সহজভাবে অগ্রসর হইতেও পারিতেছিল না। ব্যবসা করিতে গেলে কিরূপে লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে হয়, কোন জিনিষটা কোথায় সস্তায় পাওয়া যায় এ সমস্ত তাহার একেবারে জানা ছিল না। এতদ্ব্যতিত এ কার্য্যে যতখানি সহ্য এবং ধৈর্য্যশক্তির প্রয়োজন ততখানি সুরেন তখন পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিতে পারে নাই।

সুতরাং লাভ হওয়া দূরে থাকুক, ব্যবসায় সুরেন ক্রমশঃ লোকসানই দিতে লাগিল। ইহাতে তাহাদের অভাব ও অনাটন ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইতে লাগিল। পুত্রের অক্ষমতা এবং নিরুৎসাহ ভাব সরস্বতী দেবী লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং কোথায় পুত্রের ব্যথা তাহাও তিনি অনেকটা অনুমান করিয়াছিলেন।

একদিন তিনি স্পষ্টই পুত্রকে বলিলেন,— "হ্যাঁরে তুই আর লক্ষ্মীদের বাড়ী যাস্‌না !"

আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সুরেন উত্তর করিল হ্যাঁ যাই, তবে সময় পাইনা বলে তেমন যেতে পারি না।

সময় না পাওয়া যে ওজর আপত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে সরস্বতী দেবী ইহা বুঝিতেন, লক্ষ্মীর সহিত সুরেনের যে কিছু একটা হইয়াছে ইহাও তিনি অনেকটা অনুমান করিয়াছিলেন। তাই তিনি সহসা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "বল্‌তে পারিস্‌ সুরেন, মানুষের হৃদয় বড় না অবস্থা বড় ? মানুষের কথা বড় না ব্যবহার বড় ?"

"হঠাৎ একথা জিগেস কচ্ছ কেন মা "

"সঠিক উত্তর তোর কাছ থেকে জান্‌তে চাই বাবা ! এর উত্তর তোকেই দিতে হবে।"

খানিক্ষণ চিন্তা করিয়া সুরেন বলিল "মানুষের হৃদয়ই সব চেয়ে বড় মা। কিন্তু অবস্থার চাপে অনেক সময় মানুষের হৃদয়ের ভাব পরিষ্কার ভাবে পরিস্ফুট হইতে পারে না।"

"ঐটেই সম্পূর্ণ ভুল সুরেন। মানুষের কোন অবস্থাই তার উন্নত হৃদয়কে কখন অবনত কর্ত্তে পারে না। হৃদয়ে যদি দৃঢ়তা থাকে, সংকল্প যদি স্থির থাকে, কোন অবস্থাতেই মানুষ বিচলিত হয় না। দুর্ব্বলতা জয় করাই মানুষের মনুষ্যত্ব সমস্ত উপহাস বিদ্রূপকে তুচ্ছ জ্ঞান করাই

উন্নত হৃদয়ের পরিচয়। কারুর অপ্রিয় কথায় মুহ্যমান হয়ে যাওয়াই তো দুর্ব্বলতার লক্ষণ। আমার ছেলে তুমি, তোমার মনে কখন যে এ দুর্ব্বলতা আসবে তা আমি আশা করিনি। আমি লক্ষ্য করেচি সুরেন যে উৎসাহ নিয়ে তুমি কাজে নেমেছিলে সে উৎসাহ তোমার নাই। লোকের উপহাস বিদ্রুপ এর জন্য দায়ী নয়, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাও এর জন্য দায়ী নয়—এর জন্য দায়ী সম্পূর্ণ তুমি একা, তোমার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা।"

সুরেন কোন উত্তর করিতে পারিল না। অধোবদনে জননীর স্নেহ ভৎর্সনা শুনিয়া যাইতে লাগিল। সরস্বতী দেবী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, "মানুষের কথায় কিছু এসে যায় না সুরেন। মানুষের কথার চেয়ে মানুষের ব্যবহারের মূল্য বেশী, তাও দুদিনের ব্যবহার নয়, স্থায়ী ব্যবহার।"

সুরেন বলিয়া উঠিল "কিন্তু মা হৃদয়ের পরিচায়ক তো ভাষা। মানুষের মনের ভাব তো কথাতেই প্রকাশ পায়। "সব সময় তা সত্যি নয় বাবা। মনের ভাব অনেক সময় ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ভাষাই যে সব সময়ে ভাবের মাপ কাটি তা নয় বাবা। ভাষা ছলনা কত্তে পারে প্রতারণা কত্তে পারে। কিন্তু ব্যবহারে কোন ছলনা নাই কোন প্রতারণা নাই। ব্যবহারই হচ্ছে হৃদয়ের প্রকৃত দর্পণ।" "কিন্তু মানুষ ব্যবহারের চেয়ে ভাষাকেই বেশী বিশ্বাস করে কাকীমা। আবার অনেক সময় সেই ভাষার প্রকৃত অর্থ বুঝতে না পেরে নিজের দুঃখ ইচ্ছে করে টেনে আনে।" বলিতে বলিতে লক্ষ্মী সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

লক্ষ্মীকে দেখিয়া সুরেন থতমত খাইয়া গেল এবং একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেল কারণ জননীর উপদেশবাণী শুনিতে শুনিতে সুরেন লক্ষ্মীর কথাই ভাবিতেছিল। সে ভাবিতেছিল সেই যে প্রথম দিন যে দিন সে লক্ষ্মীকে তাহার ব্যবসার কথা বলিয়াছিল এবং লক্ষ্মী শুধু একটি "তা বেশ" বলিয়া সে কথার উত্তর দিয়াছিল, সে বোধ হয় প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারে নাই কারণ তাহার প্রতি লক্ষ্মীর ব্যবহার তো একদিনের জন্যও খারাপ হয় নাই কিংবা কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। অভিমানের বশে সেই বরং লক্ষ্মীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিল।

এমন সময় যখন লক্ষ্মী আসিয়া ঐ কথাই বলিল, সরস্বতী দেবী বুঝিতে না পারিলেও সুরেন বুঝিল যে তাহাকেই ইঙ্গিত করিয়া লক্ষ্মী বলিতেছে তখন তাহার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইল এবং লক্ষ্মীকে দেখিয়া একটি কথাও

বলিতে পারিল না।

লক্ষ্মী প্রায়ই স্বরস্বতী দেবীর নিকট আসিত আজও তেমনি আসিয়াছিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই সে সরস্বতী দেবীর সমস্ত কথাই শুনিয়াছিল। লক্ষ্মীকে দেখিয়া স্বরস্বতী দেবীর অত্যন্ত আনন্দ হইল। তিনি তাহাকে আপনার কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "সেই কথাই তো সুরেনকে বোঝাচ্ছিলুম মা। জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে গেলে কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়, কত উপহাস বিদ্রূপ সহ্য কত্তে হয়। কত উঠতে হয় কত পড়তে হয়। তবে মানুষ হতে পারে তবে সে ভগবানের আশীর্ব্বাদ পেতে পারে, তবে তার জীবন সার্থক হয়।"

সুরেন ইতিমধ্যে সেখান হইতে পলাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। লক্ষ্মীর সহিত সরস্বতী দেবীর অনেক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। বেশী রাত্রি হইতেছে দেখিয়া সরস্বতী দেবী নিজেই বলিলেন, "রাত হয়ে যাচ্ছে মা বাড়ী যাও।" লক্ষ্মী বলিল "বিটু চলে গেছে কাকিমা। সে আসুক তারপর যাব।" "আমি সুরেনকে সঙ্গে দিচ্চি মা, তোমার বাবার শরীর খারাপ বলচ। দেরী করনা।"

অনেক অনুনয়ের পর স্বরস্বতী দেবী দেখিলেন যে দোকান ঘরের এক কোনে বসিয়া সুরেন হিসাবের কাগজ পত্র দেখিতেছে, বলিলেন, "লক্ষ্মীকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আয়-তো সুরেন। অনেক রাত হ'য়ে গেছে।"

মুখ না তুলিয়াই সুরেন বলিল "আমার এখন অনেক কাজ, এখন পারব না। বিটু এসে নিয়ে যাবে।" মৃদু হাঁসিয়া সরস্বতী দেবী বলিলেন, "বিটুর আসতে রাত হবে তুই দিয়ে আয়। হিসেব পত্তর পরে হবেখন।" পার্শ্বে দাঁড়াইয়া লক্ষ্মীও মৃদু মৃদু হাঁসিতেছিল। হটাৎ চোখচোখী হওয়ায় সুরেন আরও অপ্রস্তুত হইয়া গেল, "আঃ তোমাদের জ্বালায় একটা কাজ করবারও জো নেই। একলা যদি যেতে না পারে তো আসা কেন? কে আসতে বলেছিল?" সরস্বতী দেবী পুনরায় হাঁসিয়া বলিলেন, "নে পাপু তোর তুক্ক রাখ। এখন ওঠ দেখি।"

অগত্যা সুরেনকে উঠিতে হইল। একটা গাড়ী ডাকিয়া আনিয়া লক্ষ্মীকে লইয়া চলিয়া গেল। সরস্বতী দেবী বলিয়া দিলেন, "বেশী-দেরী করিস্‌নি বাবা শিগ্‌গীর ফিরে আসিস্।"

পথে সুরেন একটীও কথা বলিল না। সমানে রাস্তার দিকে চাহিয়া যাইতে লাগিল। লক্ষ্মী আর হাসি সামলাইতে না পারিয়া বলিয়া

উঠিল "ব্যবসা কল্লে বুঝি ঐ রকম গম্ভীর হয়ে থাকতে হয়?"

মুখ না ফিরাইয়াই সুরেন বলিল "হ্যাঁ।"

লক্ষ্মী হাঁসিয়া বলিল, "তা বেশ।" "তা বেশ।" "শুনিয়া সুরেনের সেদিনকার কথা মনে পড়িয়া গেল। তাড়া তাড়ী বলিয়া উঠিল তা বেশ মানে?" লক্ষ্মী কোনই উত্তর করিল না, শুধু মৃদু মৃদু হাঁসিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে সুরেন হঠাৎ লক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া বলিল "একটা কথা তোমায় জিগেস করি লক্ষ্মী এরকম করে আমায় অপমান করে তোমার কি সুখ হয়? না হয় আমরা গরীব, তাবলে একরম অপমান করাটা ভাল দেখায় না।

সহসা লক্ষ্মী গম্ভীর হইয়া গেল, বলিল "অপমান। কে তোমায় অপমান করেচে?"

"আমার দোকান থেকে জিনিষ নিয়ে যাও, তার দাম দাও কেন! আমার দোকান কি তোমাদের দোকান নয়? সত্যি লক্ষ্মী এতে আমার বড্ড অপমান বোধ হয় মনে বড্ড কষ্ট হয়।"

লক্ষ্মী পুনরায় হাসিয়া বলিল, "এই কথা! যথার্থ তোমার অপমানে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। ভাগ্যিস এই অপমানটা হয়েছিল তাইতো আজ আমার সঙ্গে কথা কইলে। নইলে যে রকম রাস্তার দিকে মুখ করে ছিলে মনে করেছিলুম বুঝি আর কখন আমার দিকে ফিরে চাইবে না।

"না না এ হাসিঠাট্টার কথা নয় লক্ষ্মী।"

"কাকীমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে অনেক কথা হয়েছিল। এতে তাঁর কোন অমত নাই। তুমি ব্যবসা কত্তে বসেছ, দান খয়রাত কত্তে দোকান করনি। জিনিষ কিনে তার দাম দেব, এতে তো মান অপমানের কথা কিছু নেই তুমিও যদি দোকান থেকে কোন জিনিষ নাও তোমারও উচিৎ তার দাম দেওয়া। কাকীমাকে জিগেস করে দেখ দেখি।"

"মা ও সব কিছু বোঝেন না।"

"কাকীমার চেয়ে তুমি বোঝ বেশী, না? তাহলে এটুকু বুঝতে পার না যে আমাদের কাছ থেকে দাম নিলে যদি তোমার অপমান বোধ হয় তাহলে তোমার কাছ থেকেও দাম নিলে আমাদেরও অপমান বোধ হয়।"

এমন সময়ে গাড়ীখানি বাড়ীর ফটকের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। লক্ষ্মী কোন কথা না বলিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। সুরেনের অপমান বোধই হউক বা রাগ হউক সেও কোন কথা বলিল না। গাড়োয়ানকে বলিল "গাড়ী হাঁকাও।" লক্ষ্মী তখনও বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে নাই, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,

"গাড়ী হাঁকাবার দরকার নেই, তুমি নাব দিকি ?"

"কেন ? এখন আমি বাড়ী যাব রাত হয়ে গেছে।"

"বেশ তো। কেউ তোমাকে আমার সঙ্গে বাড়ীর ভিতর যেতে বলচে না। গাড়ী ভাড়া কত হয়েচে ?"

"দেড় টাকা।"

"তোমার কাছে দেড় টাকা আছে ?"

"আছে, কেন ?"

"দেখি, আমার দরকার আছে। তুমি আগে গাড়ী থেকে নাম দিকি।" সুরেন গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল এবং লক্ষ্মীর হাতে দেড় টাকা দিল। লক্ষ্মী সেই টাকাটা গাড়োয়ানের হাতে দিয়া বলিল, "বাবু হেঁটে যাবে, তুই যা।" গাড়ী ফিরিয়া গেল। সুরেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরেনের দিকে ফিরিয়া লক্ষ্মী মৃদু হাসিয়া বলিল "তোমার এ দানে আমার অপমান হয় না বুঝলে ? আর এত বড়, মানুষ নও তুমি যে গাড়ী করে বাড়ী যাবে। বিন্টুকে সঙ্গে দিচ্চি হেঁটে যাও।"

খোঁচার উপর খোচা খাইয়া সুরেন যেন কেমন ধারা হইয়া গিয়াছিল। বিন্টুকে ডাকিয়া আনিতে লক্ষ্মী বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

এমন সময় চপলা, প্রকাশ ও প্রকাশের আর ও দু একটী বন্ধু ভ্রমণ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল দরজার নিকট সুরেনকে দেখিয়া সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। প্রকাশ বলিল "এই যে ফিরিওয়ালা এখানে এত রাত্রে, কি মনে করে!" চপলা হাসিয়া বলিল "ফেরিওয়ালা কি রকম! সুরেন আবার ফেরিওয়ালা হল কবে থেকে ?

আর একজন বলিল "তা জাননা বুঝি! সুরেন যে আজ কাল রুমাল টুমাল সব রাস্তায় রাস্তায় ফিরি করে বেড়ায়।"

প্রকাশ বলিল, "একদিন ট্রামে উঠেও ফেরি কত্তে দেখেছিলুম।" আবার সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

লজ্জায় ঘৃণায় সুরেন অতিষ্ঠ হইয়া সেখান হইতে একাই প্রস্থান করিল। কাহাকেও একটী কথাও বলিল না।

তখন বিন্টুকে লইয়া লক্ষ্মীও সেখানে আসিয়া পড়িয়াছিল। সুরেন চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া বিন্টুকে তাহার পশ্চাতে পাঠাইয়া দিল।

ইহাদের সমস্ত কথাই শুনিতে পাইয়াছিল। ক্রুদ্ধা এবং আহতা ফণিনীর ন্যায় ইহাদের দিকে ফিরিয়া সে বলিয়া উঠিল, "আপনাদেরই মুখে একথা শোভা পায় প্রকাশ বাবু। আপনারা কেউ

বাপের পয়সায় বড় মানুষী কচ্ছেন, কেউ শশুরের পয়সায় নবাবী কচ্ছেন, আবার কেউ বা পরের ঘাড় ভেঙ্গে বাবুয়ানী কচ্ছেন। সৎপথে থেকে স্বাধীন উপার্জ্জন কি আনন্দ তা আপনাদের মত হতভাগ্যেরা কি বুঝবেন। আর দিদি, এদের সঙ্গে মিশে তুমিও উচ্ছন্ন গেছ। লক্ষ্মী আর সেখানে না দাঁড়াইয়া একবারে পিতার কক্ষে চলিয়া গেল।

যাইতে যাইতে সুরেন লক্ষ্মীর সব কথাই শুনিয়াছিল। কিন্তু তখন ফিরিয়া আসিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না।

(ক্রমশঃ)

পরলোকের পরিচয়

(শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

প্রথম প্রসঙ্গ।

পরলোক কোথায়? মৃত্যুর পর মানব কি গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহ-জীবন ও পর-জীবনে সম্বন্ধ কি? এই সকল গম্ভীর তত্ত্ব কথা পাশ্চাত্য জগতের বৈজ্ঞানিকগণ নানা প্রকারে আলোচনা করিতেছেন। তাঁহারা যখন আত্মার অমরত্বের পরিচয় পাইয়াছেন, তখন তাঁহাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে, মৃত্যু বা দেহের বিনাশ মানব জীবনের শেষ নহে। এই বিশ্বাসের বলে, আলোচনা ও পরীক্ষা করিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মৃত্যুর পর মানবাত্মা পরলোকে অবস্থান করে, তাঁহাদের সাক্ষাৎ লাভ করা অসাধ্য নহে ও তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিয়া পরলোকের পরিচয় অবগত হওয়া যায়।

যে সকল মহাত্মা বর্ত্তমানকালে পরজগৎ-বাসীদিগের সহিত পরিচিত হইয়াছেন ও তাঁহাদের কৃপায় পারলৌকিক জগতের সংবাদ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, মৃত্যু যবনিকার অন্তরালে আত্মার অভিনয় অবলোকন করিয়াছেন, তন্মধ্যে মিষ্টার জন্ লব, এক, আর, জি, এস মহোদয়ের নাম অন্যতম। ইনি ইংরাজ সমাজে সামান্য দরের লোক নহেন। এক সময়ে পরলোকগতা মহারাণী ভিক্টোরিয়া উইণ্ডসর প্রাসাদে ইঁহাকে সাদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। ইনি আজীবনকাল পারলৌকিক তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া পরলোকবাসীদিগের নিকট হইতে পরলোকের যে পরিচয়

পাইয়াছেন তাহা অকপট ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তদবলম্বনে আমরা "পরলোকের পরিচয়" প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১। শ্মশান-ভূমি।

পরলোকের কথা বলিতে গেলে, প্রথমে শ্মশান-ভূমির দৃশ্য মনে পড়ে। কারণ এই স্থানেই প্রথম ছাড়াছাড়ি, এই স্থানেই জড়ের বিনাশ ও সূক্ষ্মের পরিবর্তন আরম্ভ হয়। জড়-জগতের ইহাই শেষ সীমা, সূক্ষ্ম জগতের ইহাই আবার তোরণ দ্বার। এই শ্মশান রাজ্যের বিরাট সাম্য নীতি একবার আলোচনা কর। দেখ! তোমাদের সমাজে দেহের যে গৌরব, দেহের যে সম্মান দেহ লইয়া যে অভিমান, সে দেহের পরিণাম কি? হেথায় রাজার দেহ, রাখালের দেহ, ধনীর দেহ, ভিখারীর দেহ, পণ্ডিতের দেহ, মূর্খের দেহ, সাধুর দেহ, অসাধুর দেহ, ব্রাহ্মণের দেহ, চণ্ডালের দেহ—সকলেরই গতি এক। অতএব দেখ, দেহ লইয়া তোমরা গৌরব কর, যে জড়-দেহের অভিমানে উন্মত্ত হইয়া দলাদলি কর, সে দেহের পরিণাম কি? জড়-জগতের শেষ সীমায় রাজা, রাখাল, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ সকলকেই জড়দেহ ত্যাগ করিয়া মৃত্যুর তোরণ পথ দিয়া আত্মধামে বা সূক্ষ্ম-জগতে প্রবেশ করিতে হয়। সে জগতে তোমার আত্মার প্রতিবিধি হইয়া থাকে, কারণ আত্মা অবিনাশী, তথায় তোমার জড়দেহ যাইতে পারে না, কারণ তাহা শ্মশান-ভূমে ধ্বংস হইয়া যায়। মন ও বুদ্ধি লইয়া আত্মার বিকাশ; অতএব পরলোকে তোমার জড়-দেহের পরিবর্তে কেবল মানসিক দেহের বিকাশ হইয়া থাকে। অতএব ইহ-জগতে তুমি যদি শত লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া কেবল দেহের সুখ বৃদ্ধি করিয়া থাক, পার্থিব ধনের অধিকারী হইয়া পদ-মর্য্যাদা ও সামাজিক গৌরব পাইয়া থাক, পর-জগতে তাহা তোমার কোন উপকারে আসিবে না। কারণ তথায় সামাজিক বা আর্থিক উন্নতির কোন মূল্য নাই, তাহা শ্মশান রাজ্যের বিরাট সাম্য নীতির শাসন-দণ্ডে বিনষ্ট হইয়া যায়। তথায় মানসিক বৃত্তি লইয়া বিচার হয়, যাহার হৃদয়ে যতটুকু পরিমাণে উচ্চ মানসিক বৃত্তি পরিস্ফুট, তিনি পারলৌকিক সমাজে সেই পরিমাণে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন। ইহ-জগতের সমাজে তোমাদের জড়-দেহের ভিতর আত্মা আবদ্ধ থাকে, মনের গতি চিন্তার স্রোত, দেহের আবরণে আচ্ছাদিত থাকে, সুতরাং মহাপাপী ইন্দ্রিয় সেবা, অর্থবলে বা বিদ্যাবলে, জড় জগতে পদ-মর্য্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হয়।

মৃত্যুর পর যখন জড়দেহ রূপ আবরণ বা "খোলস" ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম শরীর পরলোকে প্রবেশ করে, তখন মানবের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কারণ মনটাকে ঢাকা দিবার, বা মানসিক দেহের অবস্থা লুকাইয়া রাখিবার উপাদান তথায় নাই। সে উপাদান যে শ্মশান ভূমে লয় হইয়া গিয়াছে। গাত্রে যদি ক্ষত স্থান থাকে, তাহা বস্ত্রাচ্ছাদিত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ঐ আচ্ছাদন অপসারিত করিলে সে ক্ষত চিহ্ন লুকাইয়া রাখা কি সম্ভবপর? পরজগতেও মানব ঠিক এইরূপ অবসর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাই ইহলোকে যে সকল মানব পদ-মর্য্যাদা ও সামাজিক গৌরবে সম্মান প্রাপ্ত হয়েন, অথচ যাঁহাদের মনের অবস্থা নীচ, তাঁহারা পারলৌকিক সমাজে অতি শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, আর ইহজগৎ সমাজে যাহারা নীচ জাতীয় বা নির্ধন, অথচ উচ্চ মানসিক বৃত্তিসম্পন্ন তাহারা পারলৌকিক সমাজে পরমানন্দে কালযাপন করেন।

সময়ে সময়ে "মিডিয়মের" সাহায্যে বা অন্তবিধ উপায়ে যে সকল দেহ-মুক্ত আত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহাদিগকে প্রশ্ন করিয়া এই সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। কোন কোন যোগী পুরুষ তাঁহাদের অতীন্দ্রিয় শক্তিবলে মৃত্যুর পর মানব দেহের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। কথিত আছে, এই বঙ্গদেশে এক সময়ে কোন যোগী পুরুষ গঙ্গাতীরে বসিয়াছিলেন। তথায় এককালে দুইটী দেহ তীরস্থ করা হয়। ইহার মধ্যে একজন সমাজে ধার্ম্মিক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল ও বহু লোকে তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিত। অপর দেহটী কোন নীচ জাতীয় লোকের। যখন ঐ ধার্ম্মিকের দেহ হইতে প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইয়া গেল, তখন তাহার পার্শ্বচরেরা তাহার সজ্ঞানে গঙ্গা লাভ হইয়াছে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ যোগী পুরুষ তদ্দর্শনে বিদ্রুপাত্মক হাস্ত করিলেন মাত্র। ইহার কিয়ৎকাল পরে যখন নীচ জাতীয় দেহধারীর মৃত্যু হইল, তখন যোগী পুরুষের নয়ন হইতে অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই বৈষম্য দেখিয়া কোন ভাবুক, যোগী পুরুষকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে সাধু বলিলেন—"বাবা! তোমায় বুঝাইব কিরূপে? তোমরা জড় চক্ষে যে সূক্ষ্ম অবয়ব দেখিতে পাও না, এবং যাহা দেখিতে পাও না বলিয়া বিশ্বাস করিতে পার না, আমরা যোগবলে তাহা দেখিতে পাই। ঐ যে দুইটী দেহ হইতে আত্মা বহির্গত হইয়া

হইয়া গেল, আমি তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যখন ধার্ম্মিক আখ্যা প্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইল, তখন দেখিলাম উহার মানসিক দেহ কি জঘন্য বৃত্তিময়। তোমরা উহার সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হইতেছে ভাবিয়া আনন্দ করিতেছ আর আমি উহার আত্মার অধোগতি দেখিয়া, ইহ-পরলোকের প্রভেদ অনুভব করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়াছিলাম। আর যখন ঐ নীচ জাতীয় মনুষ্য দেহের মৃত্যু হইল, তখন দেখি যে উহার মানসিক দেহ কি অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়, কেমন বিমল ও পবিত্র ভাবে পরিপূর্ণ। তদ্দর্শনে আমি ভাবিলাম, হায়! জড়-জগতে যাহার দুর্গতি, সূক্ষ্ম জগতে তাহার কি অপরিসীম শান্তি! এই চিন্তায় ভগবৎ ভাবের উদয় হওয়ায়, আমার নয়নে অশ্রুপাত হইয়াছিল।"

এটী এদেশের ঘটনা; কিন্তু ঘটনাটি উদ্দেশ্যের সহিত লব সাহেবের মতের ঐক্য রহিয়াছে বলিয়া এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইহা উদ্ধৃত হইল। অনেকে এ ঘটনার কথা অবিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু আত্ম-বিজ্ঞানবিদ্ লব সাহেব এই তত্বটী প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সে প্রমাণ অর্দ্ধ শিক্ষিত, সহজ বিশ্বাসীদিগের নিকট প্রদত্ত হয় নাই, বিলাতের বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিত কুটতার্কিকদিগের সমক্ষে প্রদত্ত হইয়াছে।

যাহা হউক আমরা দেখিলাম, পর-জগতে আত্মার খেলা, মনের খেলা; জড়দেহের সহিত তথায় কোন সম্বন্ধ নাই। আর সেই মনের গতি অনুসারে তথায় আত্মার স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ বা সমৃদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ইহ-জগতেও কি আমরা সেই মনের প্রভাব দেখিতে পাই না? বাস্তবিক পক্ষে মন দেহের কর্ত্তা, প্রত্যেক কর্ম্ম করিবার আগে আমাদের মনে সেই কর্ম্মের ছায়াপাত হয়। পরে মানসিক শক্তি উত্তেজিত হইলে শরীরের অবয়বগুলি সতেজ হয়, এবং প্রভু মনের আদেশ বুঝিয়া লয় ও তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ প্রতিপালন করে। নিদ্রিতাবস্থায় ও অন্যান্য সময়েও আবার দেখি যে, অবয়ব চালনা না করিয়া কেবল মানসিক চিন্তা দ্বারা আমরা কর্ম্ম করিতে পারি। যথা—স্বপ্ন, ভ্রমণ, আহার ইত্যাদি, এবং জাগ্রত অবস্থায় কোন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের চিন্তা ও তাহার উপলব্ধি। অতএব দেখা যাইতেছে, ইহ-জগতেও মানসিক চিন্তা দ্বারা জড়দেহ চালিত হয়। (ক্রমশঃ)

বিপ্লবীর ডায়রী

(শ্রীশুভব্রত সিংহ চৌধুরী)

সে ছিল একটা জোছনা ধোওয়া চাঁদনী রাত। আকাশ নীলবসনে তার সমস্ত দেহ আবৃত করে কেবল তার চাঁদমুখ খানায় যেন নীল বসন টেনে দিতে ভুলে গেছল। কোথাও কিছু ছিল না। চতুর্দ্দিক নীরব নিথর। শুধু মাঝে মাঝে বাতাস কোন সুদুরের পার থেকে কোন এক অজানা সঙ্গীতের সুরের রেশ ভাসিয়ে নিয়ে এসে প্রাণের দ্বারে আঘাত করছিল। অদূরের একটা হাস্নাহেনার গাছ থেকে মুঠো মুঠো গন্ধ কুড়িয়ে এনে দুষ্ট বাতাস গায়ে মুখে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছিল। একটু দূরের একটা প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধার গাছ মাঝে মাঝে একটু নড়েচড়ে বড় সন্তর্পণে যেন হাতছানী দিয়ে ডাকছিল—আয়, আয়, আয়। ঋতুরাজ তখনও এসে আকাশে-বাতাশে বনে-মনে মাঠে-বাটে তার প্রাণের লালসা আগুণ জ্বালিয়ে দেন নি। কেবল আগে থেকে তার আগমনী গা'বার জন্য একটা আপন ভোলা কোকিলকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে সেদিন সেই মাত্র সুদূরের কোন এক গাছে—হয়ত বা কোন এক পুষ্পিত চম্পক বৃক্ষের উচ্চশাখে বসে সুরের লহরী আকাশের গায় ছড়িয়ে দিচ্ছিল। এমন সময় আলোছায়ার আলপনা দেওয়া পথ দিয়ে, কে এক জন, আমি বাঁধান ঘাটের যে সিঁড়িটায় বসে ছিলাম তা'রই পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। মুখ না ফিরিয়েও বুঝেছিলাম—যাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম সেই।

বুকের রক্ত বড় দ্রুত নৃত্য করে উঠল। এতক্ষণের বাহিরের সমস্ত কবিত্ব যেন এক নিমেষে অন্তরে গিয়ে হাজির হলো। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা মনে ছিল না। সমস্ত জগতকে ভুলে গেছলুম। মনে ছিল না যে আমরা দুজন তরুণ তরুণী,—এমন ভাবে এমন স্থানে দাঁড়িয়ে থাকা অশোভনীয়। আমি বিপ্লবী, আমি একটা কঠোর কর্ত্তব্য সম্পাদনার্থে এখানে এসেছি, সব ভুলে গিয়ে এক স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করতে ছিলাম। সে রাজ্যে এজগতের ভাঙ্গা-গড়া, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, স্থায়-অন্যায়ের কোলাহল ছিল না। সেখানে এজগতের জোছনা ছিল না, ফুলের গন্ধ ছিল না, বাতাস ছিল না, বসন্ত ছিল না। সেখানে ছিল একটা জগত—সেটা বাহির নয় অন্তর। সেখানে ছিল

স্বর্গীয় জ্যোতি। সেখানে চাঁদের পরিবর্ত্তে ছিল মুক্ত পরমাত্মা তারই পায় মিশবার জন্ম হাত ধরা-ধরি করে, আমরা দুজন তরুণ তরুণী নয়, জীবাত্মা রূপে পুরুষ আর প্রকৃতি। সেখানে নিয়ে যেতে পারিনি আমাদের দেহ—সেখানে নিয়ে গেছলুম আমাদের উভয়ের একটী মিলিত পবিত্র আত্মা। সেখানে বসন্ত পরিবর্ত্তনশীল নয় কিন্তু চিরবসন্ত বিরাজমান।

হঠাৎ স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। মনে পড়ে গেল এসব ভাববার এখনও সময় আসেনি। সম্মুখে যে আমার অসীম কর্ত্তব্য—আমি যে বিপ্লবী, আমি যে অন্যায়ের ধ্বংসের জন্ম হাতে নিয়েছি প্রলয় বিষাণ, পরাধীন জগতকে মুক্ত করবার জন্ম দধিচীর মত অস্থি পঞ্জ করেছি পণ। আজ যে এখানে এসেছি মস্ত বড় একটা কর্ত্তব্যের বোঝা মাথায় নিয়ে। আমি যে এসেছি আজ এখানে সমস্ত সুখ আশা নিজ হাতে বলি দিয়ে যেতে। আর ত এজগতে আমার সুখ বলে কোন জিনিষ থাকবে না। এখন থেকে সারা-জীবন বয়ে যাবে একটা নীরস কঠোর কর্ত্তব্য। চিনির বলদের মত সারা দুনিয়ার জন্ম বয়ে নিয়ে যাব মধু আর আমার জন্ম রইল শুধু পিঠের ও পরের বোঝা। তাই ভাল এ দুনিয়ার সুখ দু'দিনের, কর্ত্তব্য চির দিনের। তারই ওপর দণ্ডায়মান থাকতে হবে অসীম অনন্ত কাল। তারই জন্ম প্রেয়কে ছেড়ে শ্রেয়কে ধরব। স্নেহের নিগড়কে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আজ আমি মুক্ত হব। কিন্তু হায় সেদিন কত বড় ভুলই করেছিলাম। কত অসাধ্য সাধনই করতে গেছলাম। সেদিন জানতাম না যে স্নেহের নিগড় তৃণের চাইতে মৃদু কিন্তু আবার বজ্রের চাইতেও কঠোর। তাই বোধ হয় এত করেও মনকে সেদিন ঠিক করে বুঝিয়ে উঠতে পারছিলাম না, কোথায় যেন একটা বড় ব্যথা বাজছিল বড় খচ্ খচ্ করে উঠছিল। যে জিনিষটাকে পনের বছর ধরে বুকের রক্ত খাইয়ে পরিবর্দ্ধিত করেছিলাম সেটাকে আজ এমন নির্দ্দয় ভাবে টানবার চেষ্টা করতেই মনটা তোল্ পাড় করে উঠল, প্রাণটা আছড়ে কেঁদে উঠল। কিন্তু বাইরে সে ভাব একটুও প্রকাশ না করে বড় শক্ত হয়েই যা বলবার ছিল তা মনিকে বললাম। মুখটা গ্রামোফনের মত সব কথা গুলি বড় জোরের সহিত প্রকাশ করে গেল যে আর আমার তাকে ভালবাসবার উপায় নেই। আর তাকে আমার হৃদয়ে স্থান দেবার উপায় নাই। আমি যে বিপ্লবী। বিবাহ যে আমাদের অসম্ভব। সে যেন অপর কারোকে বিবাহ করে সুখী হয়। আমার জন্ম

যেন আর বৃথা কষ্ট করে না। আমায় যেন ভুলে যেতে চেষ্টা করে।

একি বলা যায়? উঃ কি ভীষণ কথা। তবু মরিয়া হয়ে বলে ছিলাম কিন্তু সেদিন। বড় শক্ত হয়েই বলেছিলাম। কিন্তু সেদিন প্রাণের ভিতর যখন অসহ্য যাতনা অনুভব করছিলাম তখনও মুখে তার চিহ্ন কিছুমাত্র প্রকাশ করিনি। কলজেটা যখন ছিঁড়ে যেতে চাই ছিল তখন ও মুখ তার কাজ বেশ ভাল করেই করে যাচ্ছিল। একটুও ভুল করেনি। এই ত চাই—এই ত বিপ্লবী। কর্ত্তব্যই যে বিপ্লবীর সব, স্নেহ-মমতা দয়া ভালবাসা তোমার কিছুই নাই। তোমার আছে কেবল মাত্র কর্ত্তব্য। আবার সে কর্ত্তব্য তোমার কাছেও নাই, আছে ওপরওয়ালার আদেশের মধ্যে। তুমি যে সৈন্য। আদেশই তোমার সব। প্রাণপণে আদেশ পালন করাই তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য। তাতে জীবন বলি দিতে হয় তাও আচ্ছা।

বলে ত ছিলাম অনেক শক্ত হয়ে কিন্তু লাভ হলো না কিছুই। মনির দুটী সামান্য ছোট কথা সমস্ত তর্ক সমস্ত যুক্তি সমস্ত কর্ত্তব্যের শাসন ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সে কেবল বল্লে আমাকে নাকি তার ছাড়বার উপায় নাই। বিয়ে না হয় না হবে কিন্তু ভালবাসা যাবে না। দুজনেই চিরদিন দুজনাকে ভালবাসবে। কেউ আর কোন দিন বিয়ে করবে না। তারপর সে চলে গেল কোন কথা আর আমায় বলবার অবসর দিলে না। আমি সারারাত সেখানে শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিলাম।

তারপর যা হবার তাই হলো আমি বন্দী হয়ে এলাম এই আন্দামানে আর সে একটা মেয়েস্কুলে চাকরী নিয়ে গেল নোয়াখালিতে। তারপর ত এক দুই করে পাঁচ পাঁচটা বছর কেটে গেল। তাকে আমি অনেক করে বুঝিয়ে দেখেছি কিন্তু সে কিছুতেই আর বিয়ে করল না। এখন ঠিক করেছি আর সে অনুরোধ করে তাকে আর কষ্ট দোব না। সেই আমার স্ত্রী আমিই তার স্বামী। আমরা স্বামী স্ত্রীতে উভয়ে উভয়কে চির কাল এমনি দূরে থেকেই ভালবাসব। চক্রবাক চক্রবাকীর মত আমি পরজন্মের উষার আলোকে তাকে পাবার জন্য বসে থাকব এই বঙ্গোপসাগরের এপারে আর আমার জন্য সে থাকবে ওপারে। চিরবিরহ নিয়ে এজীবনের অন্ধকার নিশাটা কাটিয়ে দোব। এই চিরবিরহই অনাবিল প্রেম প্রসব করবে। তারই ফলভোগ করব যদি অন্যকোন জন্ম থাকে, যদি অন্য কোন লোক থাকে সেখানে।

কামরূপে পাল নৃপতিগণ

[আসাম পর্যটক—শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী]

"পালয়তি ইতি পালঃ।" রাজা তাই ভূপাল, ক্ষিতিপাল নামে খ্যাত। পালবংশীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী কোন কোন নৃপতির কামরূপ অধিকারভুক্ত ছিল—দুঃখের বিষয় তৎসমুদয় বৃত্তান্ত অদ্যাবধি তমসাচ্ছন্ন গুহায় নিপতিত। প্রাপ্ত তাম্রশাসন ও প্রস্তর লিপিসমূহের পর্য্যালোচনা ব্যতীত এই রাজবংশের বিশেষ কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মহাকবি ঘনরাম (১) চক্রবর্ত্তীর "শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে" এবং সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত "রামচরিতে" পাল রাজগণের মোটামুটী বংশ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। প্রকৃত ঘটনার বিবরণ লেখা অপেক্ষা শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করা ঘনরামের প্রধান অভিপ্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। গৌড় কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত রামচরিত কাব্য খানি এসিয়াটিক সোসাইটীর যত্নে মুদ্রিত হইবার পর তাম্রশাসনোক্ত ঐতিহাসিক বৃত্তান্তসমূহ সাধারণের বোধগম্য হইয়াছে। প্রস্তর লিপি ও তাম্রশাসনের পর্য্যালোচনার দ্বারা পালরাজগণের যে-বংশতালিকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল :—

- ১ম গোপালদেব (১)
  - ধর্ম্মপাল (২)
    - ত্রিভুবন পাল
    - দেবপাল (৩)
      - রাজ্যপাল
      - ১ম শূরপাল (৪)
  - বাক্‌পাল
    - জয়পাল
      - ১ম বিগ্রহপাল (৫)
        - নারায়ণপাল (৬)
          - রাজ্যপাল (৭)
            - ২য় গোপাল (৮)
              - ২য় বিগ্রহপাল (৯)
                - ১ম মহীপাল (১০)
                  - (১১) নয়নপাল
                    - (১২) ৩য় বিগ্রহপাল
                      - (১৩) ২য় মহীপাল
                      - (১৪) ২য় শূরপাল
                      - (১৫) রামপাল
                        - (১৬) কুমারপাল
                        - মদনপাল (১৭)
                          - ৩য় গোপাল (১৮
                  - স্থিরপাল
                  - বসন্তপাল

(১) ঘনরাম—বর্দ্ধমান জেলাবাসী গৌরিশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর ঔরসে এবং সীতাদেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। কবি স্বয়ং বলিয়াছেন, "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনার আরম্ভকাল স্মরণ নাই, তবে ১৬৩৩ শকে অগ্রহায়ণ মাসে উহা সমাপ্ত হয়।" ঘনরামের রচনার মধ্যে কেবল শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়।

উক্ত রামচরিত কাব্যে বারেন্দ্র ভূমিই পাল রাজগণের "জনক ভূমি" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং পাল রাজগণ যে বাঙ্গালী ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কখৌলী নামক স্থানে প্রাপ্ত বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে, পালবংশীয় নৃপতিগণের আদিপুরুষ সূর্য্য বংশীয় ছিলেন :—

এতদস্ত দক্ষিণদৃশো বংশে মিহিরস্ত জাতবান্ পূর্ব্বং।
বিগ্রহ পালো নৃপতিঃ সর্ব্বকারর্দ্ধি সংসিদ্ধঃ॥

তাম্রশাসনের দ্বিতীয় শ্লোক।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম বাবু বলেন, "এই পালেরা এসিয়ার তৈমুর বংশের ন্যায় এবং ইউরোপের বুর্ব্বো বংশের ন্যায় নানা দেশ জয় করিয়া সেখানে রাজত্ব করিতেন।" পালবংশীয়েরা বৌদ্ধ হইলেও তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে প্রধান রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন।

পালবংশীয় নৃপতিগণের ইতিবৃত্ত ভারত ইতিহাসের এক অধ্যায় জুড়িয়া আছে। তাঁহাদিগের বিষয় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য না হইলেও একটা ইতিহাস খাড়া করিতে হইলে এই বংশীয় যে কয়জন নৃপতির মোটামুটী বিবরণ আবশ্যক, আমরা পাঠক পাঠিকাদিগকে সেগুলি উপহার দিব। পালবংশীয় যে সকল ভূপতি কামরূপ রাজ্য আক্রমণ ও তথায় আধিপত্য বিস্তারে প্রয়াস পাইয়াছিলেন প্রস্তর লিপি ও প্রাপ্ত তাম্রশাসনের মর্ম্মানুসারে (১) ধর্ম্মপাল, (২) দেবপালের আদেশে তদীয় অনুজ জয়পাল, (৩) রামপাল দেবের সেনাপতি মারণ, এবং (৪) কুমার পাল দেবের মন্ত্রী ও সেনাপতি বৈদ্যদেবের নাম অবগত হওয়া গিয়াছে।

গোপাল—

প্রস্তর লিপির মর্ম্মালোচনার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, এই বংশের আদি রাজার নাম গোপাল। তিনি ভদ্ররাজ দুহিতা দোদ্দ দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই দোদ্দ দেবীর গর্ভে সুবিখ্যাত ধর্ম্মপালের (২) জন্ম হয়। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথ স্পষ্ট লিখিয়াছেন, "পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল প্রথমে রাজ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরে মগধ অধিকার করিয়াছিলেন গৌড় রাজমালা পাঠে অবগত হওয়া যায়, "পাল রাজবংশের শাসন দণ্ড পরিচালিত হইবার পূর্ব্বে সমগ্র দেশ বহুসংখ্যক খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। এই সকল দেশের উপর কাহারও কোনরূপ আধিপত্য না থাকায় দেশ একবারে

(২) ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন—Ephigrphica Indica Vol iv, P. 120.

অরাজক হইয়া পড়িয়া ছিল। তৎকালে দুর্ব্বল সবল-কবলে নিপীড়িত হইতে ছিল। (৩) যাহাতে দেশে 'মাৎস-ন্যায় বিদূরীত হইয়া প্রজাপুঞ্জ নিরুপদ্রবে বাস করিতে পারে • তজ্জন্য তাহারা গোপাল দেবকে নির্ব্বাচিত করিয়া রাজ-পদে অভিসিক্ত করিয়াছিলেন।" ক্রমশঃ।

মালবিকা

(শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য)

২য় দৃশ্য।

রাজসভা।

মহারাজ অগ্নিমিত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট। পশ্চাতে মন্ত্রী পত্র হস্তে দণ্ডায়মান—দূরে পরিজন বর্গ অবস্থিত।

অগ্নি—আর্য্য বাহতক! বিদর্ভরাজের অভি-প্রায় কি?

মন্ত্রী—দেব! আত্মবিনাশ! পতঙ্গ যেমন জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিতে যায় ধ্বংসের আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে আত্মাহুতি দেবার জন্য; বিদর্ভ-রাজও তেমনি মহারাজের শৌর্য্যাগ্নিতে আপনাকে আহুতি কৃতসঙ্কল্প দিতে হয়েছেন।

রাজা—তিনি এখন কিরূপ সর্ত্তে সন্ধি কর্‌তে চান?

মন্ত্রী—তিনি লিখ্‌ছেন——(পত্র পাঠ)

"পুণ্যপুঞ্জ বিভূষিত মহাবল পরাক্রমশালী রাজশ্রী মহারাজ অগ্নিমিত্র অখণ্ডপ্রবল প্রতাপেষু।

সবহুমানমাবেদনম্

মহারাজ,

আমার পিতৃব্যপুত্র কুমার মাধব সেন মহা-রাজের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধনে প্রতিশ্রুত হইয়া মহারাজের নিকট গমন করিতে ছিলেন। পথিমধ্যে আমার আদেশে আমার অন্তপাল তাঁহাকে বন্দী করেন। এই সকল কথা বোধ হয় মহারাজের জানা আছে। মহারাজ আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, মাধব সেনকে সসম্মানে মুক্তি প্রদান করিতে হইবে, এবং তাঁহাকে বন্দী করিবার সময় তাঁহার ভগিনী সহসা নিরুদ্দিষ্টা হইয়াছেন—তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে।

মহারাজের আদেশ আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু আমার একটী অনুরোধ এই যে, ইতঃপূর্ব্বে

(৩) গৌড় রাজমালায় এইরূপ অবস্থা "মৎস্য-ন্যায়" নামে উক্ত হইয়াছে।

মহারাজ, আমার প্রধান মন্ত্রীকে বন্দী করিয়াছেন তাঁহাকেও ঐ সঙ্গে সসম্মানে মুক্তি দিতে হইবে। মহারাজের আদেশের আশায় রহিলাম।

ইতি—

প্রণত

রাজশ্রী কুমার সেন

বিদর্ভরাজস্য।

রাজা—ও! কি স্পর্দ্ধা! বাহতক! এই বিদর্ভরাজের কি এতটুকুও মর্য্যাদাজ্ঞান নাই আমার সঙ্গে সে কিনা বন্দী বিনিময়ে সন্ধি করতে চায়? শুনলে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। মন্ত্রি এই রাজানামের অযোগ্য নিতান্ত অপোগণ্ড বালক আমার স্বভাব-শত্রু প্রতি কার্য্যেই দেখে আসছি যে এ আমায় ছলে কিংবা কৌশলে প্রতারিত ক'রে নিজের ইষ্টসিদ্ধির পথ পরিষ্কার করতে চায়।' একে অনেক দিন বালক বলে উপেক্ষা করে এসেছি। আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। শাস্ত্র বলেন রোগ, শত্রু আর ঋণ অল্প হ'লেও উপেক্ষার যোগ্য নয়। এদের সমূলে উৎপাটিত না করলে প্রতি পদেই বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। তাহ'লে তুমি এখনি বীরসেনকে পঞ্চাশ সহস্র সেনা নিয়ে বিদর্ভরাজের বিপক্ষে অগ্রসর হ'তে আদেশ কর। কি বল মন্ত্রি, কি কিছুই আপত্তি আছে?

মন্ত্রী—মহারাজ এ বিষয়ে কি আর কারও কোন আপত্তি থাকতে পারে? তাছাড়া এই বালক অল্পদিন মাত্র সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখনও সে প্রজাদের খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেনি। সুতরাং একে নবজাত শিথিলমূল বিটপী-শিশুর মত এখন একে অনায়াসেই সমূলে উৎপাটিত করা যাবে। একে ধ্বংস করবার তো এই উপযুক্ত অবসর।

রাজা—বাহতক, দেরী কোরো না। বীরসেনকে শীঘ্র প্রস্তুত হ'তে বল।

মন্ত্রী—যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান)

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ—(স্বগতঃ) মহারাজের আদেশ আমার উপর, যে যাতে তিনি মালবিকার সঙ্গে চোখো-চোখি দেখা করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা। মহারাজ রসিক বটেন। তা আমিও এক কন্দী এঁটেছি। যাক্! শেষকালে বেরালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" হলেই হল। আমরা ত কেবল "মিষ্টান্ন মিতরে জনা"র দলে। প্রেমের ধার কোন কালেই ধারিনে। পেটসর্ব্বস্ব লোক এই পোড়া পেট নিয়েই বেহাল। আমাদের যত প্রেম সেই শ্বেতবরণা, কোমলাঙ্গী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, শ্যামবর্ণ কদলী পত্রোপরি সংস্থিতা

প্রিয়া চন্দ্রপুলির সঙ্গে। তাইত! সেই কোন ভোর বেলায় বেরিয়েছি, আর এই প্রায় এক প্রহর বেলা হ'তে চললো কেউ একবার ডেকে জিজ্ঞাসাও করলে না, ঠাকুরের আহার হ'ল কি না! পা ত' আর চলতে চায় না। পায়েরই বা আর অপরাধ কি? এই সর্ব্বাবয়বশ্রেষ্ঠ উদর মহাশয় দ্বাদশ ঘণ্টা কোন রূপ ইন্ধন পাননি সুতরাং হাত পা এখন সুভদ্রা পিসির মত পেটের মধ্যে ঢুকতে চাইছে। এক আধ ঘণ্টা নয় একেবারে দ্বাদশ ঘণ্টা বিচ্ছেদ! এ অসহ্য! হা বিধাতঃ! নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর! তোমার কি বাবা একটু দয়ামায়াও নেই! আহা! প্রিয়ার কথা এক একবার মনে হচ্ছে আর শোকবারি নয়ন পর্য্যন্ত উথলে উঠতে না পেরে জিহ্বা দিয়েই গড়িয়ে পড়ছে। রাজ্যের লোকগুলোর ও একটু দয়া ধর্ম্ম নাই। রাজ্য মধ্যে যে একটা ব্রহ্মহত্যা হয় সেদিকে কোন ব্যাটা বেল্লিকের যদি এতটুকু হুঁস থাকে? আর রাজাটা ত পাগল। "মালবিকা"! "মালবিকা!" করেই পাগল। আর আমি বেচারা যে খেটে খেটে আর না খেয়ে মারা গেলুম সেদিকে একেবারেই নজর নেই। গোল্লায় যাক্ এই হতভাগা রাজা আর গোল্লায় যাক্ এর রাজ্য।

রাজা—কি হে বন্ধু! সকাল বেলাই যে গোল্লায় যেতে আশীর্ব্বাদ করছ; কেন বল দেখি? হ'ল কি?

বিদূ—(সভয়ে) (স্বগতঃ) এ কি! এ যে মহারাজ নিজে! ওরে বাবা দেখতে না পেয়ে কি সর্ব্বনাশ করলুম। (প্রকাশ্যে) দোহাই মহারাজ! আমার কোন অপরাধ নেই। বার ঘণ্টা না খেতে পেয়ে পেট জ্বলছে বত্রিশনাড়ীতে টান পড়েছে কি বলতে কি ব'লে ফেলেছি, মহারাজ দোহাই আপনার। ব্রাহ্মণকে শূলে দেবেন না। এই গরীব ব্রাহ্মণের উপর নেক্-নজর করবেন না। দোহাই আপনার মহারাজ! আমার কাঁদতে কেউ নেই মহারাজ।

রাজা—দূর পাগল! ব'স এইখানে। আমার সে কাজের কি হ'ল?

বিদূ—(সানন্দে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক) মহারাজ মার দিয়া। কেল্লা ফতে! আপনার তো কাম্ ফ'তে! কিন্তু—এদিকে [পেটে হাত রাখিয়া]—

রাজা—[সাগ্রহে] আস্তে! বন্ধু আস্তে;—কি ব্যাপার বল দেখি? কেল্লা ফতে কি রকম?

বিদূ—[মহারাজের কর্ণে কিছু বলিলেন]

রাজা—সাধু গৌতম! সাধু! তবে না কে ব'লে তোমার বুদ্ধি নেই। এরকম বুদ্ধি বোধ হয় বাহুতকের মাথায়ও খেলে না। আমি

এখনি তোমার জন্য চন্দ্রপুলি আন্‌তে লোক পাঠাচ্ছি।

বিদূ—শতংজীবতু। মহারাজ! শতংজীবতু। আজ আপনি আমাকে যেরূপ তৃপ্তি প্রদান করতে চলেছেন এরূপ তৃপ্ত বোধ হয় জীবনে কখনও হই নি।

(নেপথ্যে বাদানুবাদ—থাক্ থাক্! আর বাহাদুরি দেখাতে হবে না! বিদ্যে আমার ত অজানা নেই। কে বড় কে ছোট মহারাজই তার বিচার করবেন)

রাজা—সখে গৌতম! তোমার কাজের ফল ফলতে আরম্ভ হয়েছে। দেখা যাক্ কত-দূর গড়ায়। তোমার নীতি-বৃক্ষে খুব ফুল ধরেছে। ধন্য, ধন্য—চন্দ্রপুলির প্রভু!

বিদূ— ফল ও ধরে এই। মহারাজ মিষ্টান্নটা শীঘ্র আনাবার ব্যবস্থা করুন আর—আর ত বসতে পারি না। (উদরে হস্ত প্রদান)।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

ক—মহারাজের জয় হোক্। মহারাজ! মন্ত্রী মশাইএর কাছে শুন্‌লাম মহারাজের আদেশ পালন করা হ'য়েছে। আর, নাট্যাচার্য্য গণদাস ও হরদত্ত দুজনে মিলে আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা ক'রে দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন।

রাজা—তাঁদের নিয়ে এস।

কঞ্চুকী—যে আজ্ঞা মহারাজ!

(কঞ্চুকীর প্রস্থান ও পুনরায় উভয়কে লইয়া প্রবেশ)

উভয়ে। মহারাজের জয় হউক্।

রাজা—স্বাগত! আপনারা আসন পরিগ্রহ করুন। এখন তো আপনাদের শিষ্যদের অভিনয় সম্বন্ধে উপদেশ দিবার সময়। এ সময়ে কিজন্য আপনারা একসঙ্গে এখানে এসেছেন! ব্যাপার কি বুঝতে পারছি না তো?

গণ—আগে আমাদের বক্তব্যটা শুনুন। মহারাজ! আপনি জানেন—আমি সদ্‌গুরুর কাছে অভিনয় কলাবিদ্যা হিসাবে অভ্যাস করেছি। মহারাজও আমাকে অভিনয়াধিকারে নিযুক্ত করেছেন। আর মহারাণীও আমায় যথেষ্ট অনুগ্রহ করে থাকেন। এ ছাড়া—

রাজা—(হাসিয়া) এ সব তো আমার জানাই আছে। তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক? এত গৌরচন্দ্রিকাই বা কেন? ব্যাপারটা কি খুলেই বলুন না।

গণ—আজ, হরদত্ত পাঁচ জনের সাম্‌নে আমায় এই বলে অপমান করেছে যে আমি ওর পায়ের ধুলারও সমান নই। তা কি সত্য? (হরদত্তর প্রতি রোষকষায়িত নয়নে দর্শন)

হরদত্ত—মহারাজ! গণদাসই আগে আমায়

অপমান করেছে। এ যখন তখন যার তার কাছে বলে থাকে যে, ওতে আমাতে সমুদ্র পল্বলের তফাৎ। ধর্ম্মরাজের কাছে আবার অনুরোধ, যেন মহারাজ আমাদের উভয়কে পরীক্ষা করে কে বড় কে ছোট তার মীমাংসা করে দেন!

বিদূ—ভাল ভাল, সুযুক্তি বটে। কই মহারাজ, চন্দ্রপুলির এত বিলম্ব হচ্ছে কেন?

গণ—চন্দ্রপুলি? সে কি?—(সকলের হাস্য)

বিদূ—আপনি বুঝবেন না এ সব।

গণ—আচ্ছা, ভাল কথা, মহারাজ! আগে আমার কথাটা মনে ভেবে দেখে তার পর বিচার করতে আজ্ঞা হোক্!

রাজা—দাঁড়ান, ব্যস্ত হবেন না। আমি একা কিছু স্থির করলে মহাদেবী এ বিষয়ে পক্ষপাত মনে করতে পারেন। সুতরাং পণ্ডিত কৌশিকী ও তাঁহার সম্মুখেই এ বিষয়ের বিচার হওয়া ভাল।

বিদূ—আহা! মহারাজের কথাগুলি যেন ক্ষীরের ডেলা—যেমন সুযুক্তিপূর্ণ তেমনি মিষ্ট। [উৎসুকভাবে অন্তঃপুরের দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত]।

রাজা—(কঞ্চুকীর প্রতি) মৌদ্গল্য! উপস্থিত ঘটনা নিবেদন ক'রে পণ্ডিত কৌশিকী ও দেবীকে অন্তঃপুরের মন্ত্রণাগৃহে আহ্বান কর।

কঞ্চুকী—যে আজ্ঞা মহারাজ! [প্রস্থান]

রাজা—আসুন আমরাও অন্তঃপুরের মন্ত্রণাগৃহে যাই। [সকলের প্রস্থান]

আশুতোষ বন্দনা

(শ্রীরামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী)

বন্দি হে শ্রীআশুতোষ কর্ম্মবীর মহাপ্রাণ
বঙ্গ ভারত পৃথিবী আজি…তব শোকে ম্রিয়মান্।
(গর্ব্ব) গৌরব হে (তুমি) বাংলার … (রত্ন) রতন্
তুমি এসিয়ার।
বীর ওহে বসুধার ওহে সর্ব্ব বিরাজমান্
(তেজের তুমি মূর্ত্তিমান্)
গীষ্পতি তুমি জ্ঞানে .. সুমেরু তুমি মানে।
দেবতা হে ত্রাণে .. সর্ব্ব কর্ম্মে আগুয়ান্।
বিশ্বরে করেছ বশ .. বিচারে রেখেছ যশ।
একাধারে নবরস .. কে আছে তব সমান?
হে দেব এ মর ভবে .. তব না মরণ হবে।
কীর্ত্তি যাঁর সেই রবে কোথা তাঁর তিরোধান।
বঙ্গ ভারত ধন্য আজ দেছ নব আন্দোলন,
গাবে ততদিন ভবে তবদেব যশোগান।

কোহিনুর বা ভারতভাগ্য

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

(শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ, এম্-ডি)

কোহিনুর তৃষা তাঁহার হৃদয়ে এরূপ প্রবল হইল যে অচিরে বহুসৈন্য সমভিব্যাহারে মেষদা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সিয়া ধর্ম্মাবলম্বী মুসলমানগণের তীর্থস্বরূপ ইমাম রিজার কবর দর্শন করিতে যাইতেছেন এইরূপ মিথ্যা জনরব রটাইয়া দিলেন। আগা মহাম্মদ সসৈন্যে সহজেই নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ইমাম রিজার কবরে প্রার্থনা করিলেন এবং অবিলম্বে ছলনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্ধ রাজা সাহরূখ সমীপে কোহিনুর দাবী করিলেন। সাহারূখ যত কোহিনুর প্রদান করিতে অস্বীকার করিতে লাগিলেন, আগা মহাম্মদ তাঁহাকে তত নানাবিধ যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল। এই রূপে অনেকগুলি মণিমাণিক্য প্রাপ্ত হইলেও আগামহম্মদ অধিকতর নিষ্ঠুর যন্ত্রণা দ্বারা কোহিনুর লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে এরূপ অত্যাচার কারল যে তাহা বর্ণনা করিতে ও ঘৃণা বোধ হয়। সেই অসহায় অন্ধ রাজার মস্তকমুণ্ডন করিয়া তাঁহার শিরোদেশে কোন পিষ্ট দ্রব্যের একটী নকল শিরস্ত্রাণ পরাইয়া দিল। আর নরাধম আগামহম্মদ, হতভাগ্য সাহারুখের মস্তকোপরি ঐরূপ তৈলাধার স্থাপিত করিয়া তন্মধ্যে ক্রমাগত উষ্ণতৈল ঢালিতে লাগিল। অসহ্য যন্ত্রণায় সাহরূখ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য এই হীরকের কি অপার মহিমা, তত্রাপি তিনি কোহিনুর হীরক অর্পণ করিলেন না। অন্ধ নৃপতি এইরূপ নৃশংস অত্যাচারে একাবারে শয্যাশায়ী হইলেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল না।

আফগান রাজ্য সংস্থাপক আহাম্মদ সাহ এই রূপনিষ্ঠুর আচরণের সংবাদ কর্ণগোচর করিলেন। ১৭৫১ খৃঃ অঃ—তিনি সসৈন্য পারস্য যাত্রা করিলেন এবং বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়া সাহরূখের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন, এবং তাঁহার কন্যার সহিত নিজপুত্র তৈমুর সাহের বিবাহ দিলেন। অন্ধনৃপতির নিকট কোহিনুরের কোন মূল্য নাই ভাবিয়া আহম্মদ সাহ তাঁহার নিকট হইতে কোহিনুর গ্রহণ করেন। (১৭৫২ খৃঃ অঃ) তৈমুরকে হীরাটে, এবং কনিষ্ঠ পুত্রকে কান্দাহারে শাসন কর্ত্তা

নিয়োগ করিয়া নিজে কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৈমুর সাহ কাবুলের সিংহাসন আরোহণ করেন ও কোহিনুর লাভ করেন। ১৭৯৩ খৃঃ অঃ তৈমুর সাহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র জুমান সাহ কাবুলের সিংহাসন ও কোহিনুর প্রাপ্ত হয়েন। কয়েক বৎসর রাজত্বের পর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মামুদ জুমান সাহকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া বিতাড়িত করেন জুমান সাহ বন্ধু সেনাপতি আশীকের শরণাপন্ন হন। আশীক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া জুমান সাহকে বন্দী করেন। জুমান সাহ তাঁহার কারাগৃহের এক দেয়ালের ফাটালের মধ্যে কোহিনুর হীরক, এবং অস্ত্র দ্বারা গর্ত্ত করিয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরে অন্যান্য ধনরত্ন লুক্কায়িত রাখেন। নিষ্ঠুর মামুদ ভ্রাতা জুমান সাহকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া দেন ও কোহিনুর হীরক প্রার্থনা করেন। কিন্তু জুমান সাহ বন্দী অবস্থায় আগমন কালে এক নদীতে কোহিনুর প্রক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করেন। দুই বৎসর পরে জুমান সাহর তৃতীয় ভ্রাতা সুলতান সুজা মামুদকে সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জুমান সাহর অনুমতি লইয়া স্বয়ং কাবুলের অধীশ্বর হয়েন। ১৮০৯ খৃঃ অঃ পেশওয়ার সাহাসুজার সহিত এলফিনষ্টোনের সাক্ষাৎ হয়। সাহ সুজা একটী ব্রেসলেটে কোহিনুর ধারণ করিয়া ব্যবহার করিতেন। একদিন এলফিনষ্টোন হীরক দেখিয়া ট্যাভারনিয়ার কর্ত্তৃক অঙ্কিত হীরক বলিয়া বিশ্বাস করেন। সাহ সুজা মামুদের নয়নদ্বয় নষ্ট করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ দিবেন বলিয়া মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জুমান সাহ এরূপ নির্দ্দয় কার্য্য করিতে তাঁহাকে নিষেধ করেন। জুমান সাহ স্বেচ্ছায় "কোহিনুর কোথায় গোপনে রক্ষিত আছে সুজকে সেই সংবাদ প্রদান করেন এবং ১৭৯৫ খৃঃ অঃ সাহা সুজা কোহিনুর অধিকার করেন। কিন্তু নিষ্ঠুর মামুদের প্রতি এই দয়ার জন্য জুমান সাহকে আবার বিপদে পড়িতে হইল। কারাগার হইতে মামুদ পলায়ন করিলেন এবং পুনরায় কাবুলের সিংহাসন অধিকার করিলেন। সাহ জুমান ও সাহ সুজা নিরুপায় হইয়া ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বে আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। সাহাসুজা পেশওয়ার হইতে কাশ্মীরে গমন করিলেন। এবং তথায় আগা মহাম্মদ সাহ সুজাকে বন্দী করিলেন।

ক্রমশঃ।

আমাদিগের এই পুস্তক-ভাণ্ডার হইতে যে সকল অমূল্য গ্রন্থরাশি প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতেছে এবং বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ-

সাধক শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

অন্যান্য গ্রন্থ।

১। **আদর্শ ব্রাহ্মণ**—ভক্তি-রসাত্মক নাটক—বহু নাট্য সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনীত হইতেছে। মূল্য ১৲ টাকা।

২। **মায়েরখেলা**—ভক্ত-হৃদয়ের পবিত্র উচ্ছ্বাস—মূল্য ৷৶৹ আনা মাত্র।

৩। **মা আমার কাল' কেন?**—মাতৃরূপের-ব্যাখ্যা-বিবৃতি—মূল্য ।৶৹

৪। **শিবের বুকে শ্যামা কেন?**—প্রশ্নের সারসিদ্ধান্ত—মূল্য ।৶৹

৫। **বিজয় ভেরী**—ধর্ম্ম-বিষয়ক সিদ্ধান্ত—মূল্য /১০ দেড় আনা।

৬। **মুক্তি**—মূল্য ৶৹ আনা।

৭। **সত্যালোকম্**—৶৹ আনা।

৮। **শোকশান্তি**—।৹ আনা।

শ্রীমৎ বিষ্ণুপুরী গোস্বামী বিরচিত ও শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল কর্ত্তৃক পদ্যানুবাদ।

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলী—ভক্তি-রসাত্মক উপাদেয় গ্রন্থ। আইভরি কাগজে ৩২০ পৃষ্ঠা আবাঁধা মূল্য—১৲ টাকা।

রামলীলা—উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত ভক্তিমূলক গ্রন্থ। মূল্য ৷৹ আনা।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

১। **ব্রাহ্মবাঘিনী** বা বঙ্গবীরাঙ্গনা—ব্রাহ্মণ রাজকন্যার অলৌকিক বীরত্ব কাহিনী—সত্যঘটনা—মূল্য ১৷৹ পাঁচ সিকা।

২। **বঙ্গবীর রণজিৎ** রায়—অপূর্ব্ব বীরত্ব-কাহিনী ইতিহাসের গৌরব চিত্র—১।৹ পাঁচ সিকা।

৩। **অভিরাম গোস্বামী**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক ঘটনাবলি পূর্ণ ভক্তিমূলক—মূল্য ১৷৹ টাকা।

বঙ্গবিখ্যাত দার্শনিক

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন প্রণীত

১। **গীতায় ঈশ্বরবাদ**—১৷৹

২। **উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ**—১৷৹

হীরেন্দ্র বাবুর বহু গবেষণা ও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ গ্রন্থ—ধর্ম্মতত্ত্বের নিগূঢ় তত্ত্বের বিশদভাবে বিশ্লেষণ—যিনি না পড়িয়াছেন, তাঁহার জীবনই বৃথা।

* * * * *

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ—চণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সাধনসহ বা দেবী-মাহাত্ম্য—"ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ" নামে প্রকাশিত—২৭৯ পৃষ্ঠা মূল্য ২৲ টাকা।

ঐ ঐ—২য় খণ্ড "বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ" নামে প্রকটিত—৩৭২ পৃষ্ঠা—মূল্য ২৲ টাকা।

ঐ ঐ ৩য় খণ্ড "শুম্ভ-বধ—রুদ্রগ্রন্থি ভেদ" মূল্য ২৲ টাকা।

সত্য প্রতিষ্ঠা—মূল্য। আনা।

কর্ম্মযোগ পুস্তক-ভাণ্ডার

"শ্রীকৃষ্ণ" পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক পরম ভাগবত

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ—প্রণীত।

(১) **রক্তজবা**—অনলবর্ষী জাতীয় কবিতাগুচ্ছ। মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় ইহার ছন্দনির্ঘোষ বিদ্যুতের ন্যায় ইহার উল্লাস, বজ্রের ন্যায় ইহার শক্তি। দেশমাতৃকার পূজার পবিত্র অর্ঘ্য মূল্য ৶০।

(২) **তিলকের তিরোভাব**—অপূর্ব্ব ছন্দোময়ী কবিতায় রচিত ধনীর কবাল কবল হইতে দারিদ্রের মুক্তির চিত্র, সহস্রশীর্ষ পুরুষের জাগরণ অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। মূল্য ৴০।

(৩) **বর্ত্তমান কর্ম্মযুগ**—(অপূর্ব্ব জাতীয় ছন্দোবদ্ধ গদ্য প্রবন্ধ) পাশ্চাত্য সভ্যতার পৃষ্ঠে ইহা দারুণ কশাঘাত তুল্য। এই মৃতকল্প জাতির পক্ষে ইহা সঞ্জীবনী সুধা স্বরূপ। মূল্য ।৴০।

(৪) **অমিত্র গীতা**—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পদ্যে এইরূপ ভক্তিপ্রবণ সহজ সুন্দর বিস্তৃত অনুবাদ আর বাহির হয় নাই। ইহা একখানি সম্পূর্ণ নূতন পুস্তক সংস্কৃত মূলের কটমট প্রতিধ্বনি নহে। অথচ মূলের সহিত প্রতি ছত্রে ছত্রে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। গ্রন্থশেষে গীতা মাহাত্ম্যের অতি সুন্দর পদ্যানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। সুন্দর বাঁধাই ১৬৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এ্যান্টিক কাগজে ছাপা—মূল্য ॥০।

(৫) **শরণাগতি**—হিন্দুমাত্রেরই নিত্য পাঠ্য। ইহা সাধনের অঙ্গ। সাধন-পথে দাঁড়াইয়া সাধকের শরণাগতির কথা মনে পড়ে। সুন্দর পয়ার ত্রিপদী ছন্দে রচিত। পাঠে শরণাগত হৃদয় মাত্রই বিগলিত হইবে। মূল্য—৴০।

ক্ষীরোদ বাবুর পুস্তকগুলি অমৃতবাজার পত্রিকা, হিতবাদী, বঙ্গবাসী প্রভৃতি সংবাদ পত্রে ভূয়সী প্রশংসিত হইয়াছে!

রিপণ কলেজের ভূতপূর্ব্ব

অধ্যাপক

শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ,

কর্ত্তৃক অনূদিত

।

সুললিত পদ্যে বঙ্গানুবাদ।

মূল্য ॥০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—কর্ম্মযোগ প্রেস ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া

হাওড়া—৪নং তেলকলঘাট রোড, "কৰ্ম্মযোগ প্রেস" হইতে শ্রীযুগলকৃষ্ণ সিংহ

দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অষ্টাবিংশ বর্ষ।]　　আষাঢ়, ১৩৩১ সাল।　　[তৃতীয় সংখ্যা।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রতিষ্ঠিত

আলোচনা

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ।

আলোচনার বার্ষিক মূল্য সডাক ২।৵০ আনা।

সূচীপত্র।

বিজ্ঞাপনের যুগে গ্রন্থকার মহাশয়েরা।

পুস্তক মাত্র ছাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। বিনা বিজ্ঞাপনে পুস্তকের কাটতি করার আশা দুরাশা মাত্র। অনেক গ্রন্থকারও সর্ব্বগ্রাসী প্রকাশকদের কবল হইতে বাঁচিবার আশায় কষ্টেস্বষ্টে নিজের খরচায় পুস্তকাদি ছাপাইয়া থাকেন কিন্তু বিজ্ঞাপনের অভাবে কিছুই করিতে পারেন না। এদিকে পুস্তক বিক্রেতারা শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন লইয়া 'কাটতি' বই বিক্রয় করেন বইএর কাটতি বাড়াইবার জন্য বিজ্ঞাপনাদি প্রচার করেন না। এই সব অসুবিধা দূর করিবার জন্য আমরা মাত্র শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন লইয়া নিজ ব্যয়ে আমাদের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া ও অন্যান্য উপায়ে কাটতি বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া থাকি। ইহাতে গ্রন্থকারগণ তাঁহাদের নিজ পুস্তকাবলীর কয়েক কাপি আমাদের পুস্তক ভাণ্ডারে জমা রাখিলে আমরা বিজ্ঞাপনাদির দ্বারা কাটতি করিবার চেষ্টা করি। পত্র দ্বারা সবিশেষ অবগত হইবেন।

নিবেদক—ম্যানেজার—আলোচনা।

৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

কি ক'রে বুঝাব

"বামাক্ষেপা" ও "শক্তি-সাধনা"

কিরূপ উপাদেয়?

আলোচনা পত্রিকার নিয়মাবলী।

আলোচনার বার্ষিক মূল্য সহর মফস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ২।৵০ আনা। সাধারণ সমিতি বা পাঠাগার হইতে ৴১০ অৰ্দ্ধ আনার টিকিট সহ আবেদন করিলে নমুনা প্রদত্ত হইবে। বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ।

বিজ্ঞাপন দেওয়ার নিয়ম—মাসিক একপৃষ্ঠা বা দুই কলম—৮৲, অৰ্দ্ধপৃষ্ঠা বা এক কলম ৪।০, সিকি পৃষ্ঠা বা অৰ্দ্ধ কলম—২।০ সিকি কলম—২৲।

কভারের পৃষ্ঠার জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম। ছয় মাস বা তদূর্দ্ধ কালের জন্য বিজ্ঞাপনে স্বতন্ত্র চুক্তির দর দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। চুক্তির বিজ্ঞাপন তিন মাসের মধ্যে পরিবর্ত্তন করা হয় না।

আলোচনার জন্য বিনিময় পত্রিকা ও প্রবন্ধাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে। অন্যান্য চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই আমার নামে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ,

কর্ম্মযোগ প্রেস, ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

(ফোন নং ১৯১ হাওড়া)

সীতা

(অধ্যাপক শ্রীমতিলাল চট্টোপাধ্যায় এম্-এ)

অশোক-বন

রাবণের প্রতি

দাঁড়াও যেখানে তুমি ; এক পদ যদি
হও অগ্রসর হবে তখনি সংহার
সতীত্ব বহ্নির তেজে পতঙ্গের প্রায়
হর কোপানলে স্মর হইল যেমতি।
মধ্যে ব্যবধান মাত্র তৃণ এক গাছি
লঙ্ঘন করহ এরে কত শক্তি ধর।
লঙ্ঘিয়াছ বারিনিধি অপার সাগরে
তুলেছ কৈলাস তোল দেখি এই তৃণে ?
তপস্যার বলে আর পিতৃ-পুণ্যবলে
পাইয়াছ রক্ষা তুমি যবে মূঢ়মতি
স্পর্শিলে আমার তনু অরণ্য মাঝারে।
সে তেজ তোমার ক্ষয় হইয়াছে এবে
বিশ্রবার পুত্র আর পুলস্ত্য সুকৃতি
তারিতে নারিবে সতী কোপানল হতে।
পারি আমি ভস্মীভূত করিতে এখনি
কিন্তু তপস্যার ক্ষয় হইবে তাহায়।
কত মুনি কত ঋষি হলেন বিনাশ
রাক্ষসের হাতে তবু ক্রোধ প্রকাশিয়া
নাহি করিলেন ধ্বংস ব্রহ্মঘাতী পাপে।
চাও যদি পরিত্রাণ যোড় হস্ত করি
সমর্পহ মোরে মোর পতির চরণে।
বড় ক্ষমাবান্ তিনি ক্ষমিবেন তোমা
নাহি করিবেন ধ্বংস মহর্ষি তনয়ে
পাবে পরিত্রাণ তব স্বর্ণপুরী লঙ্কা
পাবে পরিত্রাণ তব পুত্র পৌত্র ভ্রাতা।

কি দেখাও মোরে লোভ তুমি দীর্ঘআয়ু
পতি মম অল্প আয়ু, তুমি দশ মুণ্ড
বিংশতি সংখ্যক হস্ত বিংশতি লোচন।
পতি মম একমুণ্ড দ্বিভুজ দ্বিনেত্র।
তুমি রাজচক্রবর্ত্তী তিনি বনবাসী।
তুমি ক্ষৌম পরিধারী চীরধারী তিনি।
সুবর্ণ মুকুট তব শিরে তাঁর শিরে

জটাভার, তব শয্যা পালঙ্ক উপরি
তাঁর তুমি তৃণশয্যা কুটিরে নিবাস।
শত আয়ু কিম্বা শত কোটি যুগধারী
হোন তিনি, পতি তিনি মম অন্যে নয়।
এক শীর্ষ হোন কিম্বা সহস্র মস্তক
দুই বা সহস্র বাহু পতি তিনি মম।
ভিখারীই হোন আর ইন্দ্রত্ব প্রদাতা
তিনি পতি মম, তিনি এক মাত্র ধ্যান।
ভূমি-শয্যা হোক কিম্বা অনন্তে শয়ন
জটাধারী হোক কিম্বা সুকোমল কেশ
অলঙ্কৃত শির তাঁর স্বামী তিনি মম।
ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্র আদি দেবগণ
করুন তাঁহার স্তব কিম্বা রক্ষাধম
কর নিন্দা তুমি তাঁর পতি তিনি মম।
সহস্র বদনে শেষ নারুন বর্ণিতে
অশেষ মহিমা তাঁর কিম্বা মূঢ়মতি
করহ তাঁহার গ্লানি দশ মুখে তব
পতি তিনি মম তিনি পরম দেবতা।
অন্ধ হোন্ মূক হোন হউন বধির
হউন কদর্য্যাকৃতি দুঃখী পতি তাঁর
কোন সতী পতি ছাড় অন্য জনে ভজে

কি দেখাও মৃত্যুভয় নাহি তাঁরে ডরি
মৃত্যু-ভয় নাহি করে কোন সতী নারী।
কামবলে ক্রোধ রিপু করি পরাজয়
করিতেছ দীর্ঘতর জীবন আমার।
নাহি বধিতেছ প্রাণে। জীবন জীবন
বিনা কিবা কায মম এ ছার জীবনে।
করহ এখনি ধ্বংস। ক্ষতি মাত্র এই
নাহি পাইলাম আমি দেখিতে নয়নে
পতির চরণ পদ্ম চির ধ্যান যাহা।
মুকুল জীবন সম অকূলে ভাসিল
নারিনু সেবিতে তাঁর চরণ যুগল।
রাজা তুমি মন্ত্রী নাই দেয় উপদেশ
মন্দোদরী রক্ষনীয়া যথা তব কাছে
সেইরূপ রক্ষনীয়া আমিও তোমার।
রাখ ধর্ম্ম, ছাড় এই দুর্ব্বুদ্ধি ভীষণ
ইহ কালে পর কালে হবে তুমি সুখী।
সতীনারী তবগৃহে ভুজঙ্গিনী প্রায়
দংশিবে তোমায় যদি কর অন্য মত।
বিষের জ্বালায় হবে অস্থির ব্যাকুল।
পুত্রে পৌত্রে পাঠাইয়া শমন মন্দিরে
মৃত্যু আলিঙ্গিতে যাবে সানন্দ অন্তরে।

বিচার

(শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ)

৪।

অক্ষয় বাবু অর্দ্ধনিমীলত নয়নে চুপ করিয়া আপনার ঘরে শুইয়াছিলেন। নীচে এত কাণ্ড হইয়া গেল তাঁহার কর্ণ-কুহরে কিছুই প্রবেশ করে নাই। তিনি নিজের চিন্তার মধ্যেই ডুবিয়া ছিলেন।

লক্ষ্মী যখন তাঁহার নিকটে আসিয়া ক্রন্দন-বিজড়িত স্বরে "বাবা" বলিয়া ডাকিল, তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিলেন "কি হয়েছে কাঁদচিস্ কেন?

লক্ষ্মী কোনই উত্তর করিতে পারিল না। পিতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বিশেষ আঘাৎ না পাইলে স্বভাব গম্ভীরা লক্ষ্মীর চোখ হইতে কখন জল বাহির হইত না, অক্ষয় বাবু ইহা বিলক্ষণ জানিতেন।

তাই তিনি লক্ষ্মীর ক্রন্দন দেখিয়া অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "কি হয়েছে মা? কেউ তোমায় কিছু বলেচে।"

অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়া লক্ষ্মী বলিল, "এ বাড়ীতে তোমার কোন শাসন নেই বাবা। তুমিই বাড়ীর কর্ত্তা অথচ তোমার কোন ক্ষমতা নেই।" কন্যার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে অক্ষয় বাবু বলিলেন, "কি হয়েচে মা? কিছু তো বুঝতে পাচ্চি না।"

"কি অধিকারে প্রকাশ বাবু সকলকে অপমান করেন? আর কি অধিকারেই দিদি সেই অপমানে যোগ দেন?" "কাকে অপমান করেচে মা? কি বলেচে?"

"প্রকাশ বাবু, প্রকাশ বাবুর বন্ধুরা সকলেই 'ফেরিওয়ালা' বলে অপমান করেচে। তাতে দিদিও যোগ দিয়েছিল।" লক্ষ্মী পুনরায় পিতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। "সুরেন বুঝি তোমার সঙ্গে এসেছিল মা? তাকেই ওরা অপমান করেচে?"

লক্ষ্মী কিছু বলিল না। অক্ষয় বাবু কন্যার চক্ষের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "এ ওদের নিশ্চয়ই অন্যায় মা। তোমার দিদির ঔদ্ধত্য দিন দিন বেড়ে যাচ্চে। ছিঃ মা, লক্ষ্মী কেঁদ না। কালই আমি এর প্রতিকার করব। তা সুরেনকে ওপরে নিয়ে এলিনি কেন মা?

"কাকীমা গিন্নীর ফিরে যেতে বলেছিলেন

তা ছাড়া এ অপমান সহ্য করে কে এখানে আসবে বাবা? এ রকম করে যদি ওরা বাড়াবাড়ী করে তা হোলে তো দেখচি এখানে লোকজন আসা বন্ধ হয়ে যাবে।"

"মা মা, এর প্রতিকার আমি নিশ্চয়ই করব। আজ সুরেনকে অপমান করেচে, সে না হয় পরের ছেলে, কাল যদি অপর কোন লোককে অপমান করে? এ ভারী অন্যায়।"

এ সম্বন্ধে আরো কিছুক্ষণ আলোচনার পর লক্ষ্মী সহসা বলিয়া উঠিলেন, "বাবা রাত যে অনেক হয়ে গেছে, এখন তোমার খাওয়া হয়নি? মৃদু হাসিয়া অক্ষয় বাবু বলিলেন, "তুই বাড়ী ছিলি না মা, কে বুড়ো বাপকে খেতে দেবে বল? অপ্রতিভ হইয়া লক্ষ্মী তাড়াতাড়ী পিতার আহারের ব্যবস্থা করিতে গেল।

খাইতে খাইতে অক্ষয় বাবু বলিলেন, "শুনেছিস্ মা, মণ্টু কলেজ ছেড়ে দিয়েছে?" লক্ষ্মী সম্মুখে বসিয়া পিতাকে খাওয়াইতে ছিল। অবাক হইয়া বলিল, "সে কি বাবা! কলেজ ছেড়ে দিলে কেন? তুমি কিছু বললে না?

মৃদু হাসিয়া অক্ষয় বাবু বলিলেন, "কি বলব মা? ছেলে মানুষত নয়।

"ঐ তোমার কেমন একটা কথা। ছেড়ে দেবার কারণ কি বল্লে?"

"বল্লে লেখা পড়া শিখে পরের গোলামী করব না। তার চেয়ে দেশের কাজ কল্লে অনেক উপকার হবে।" "থিয়েটারে রিহার্সাল দেওয়া বুঝি দেশের কাজ?" "বল্লে কংগ্রেসে নাম লিখিয়ে ভলাণ্টারি করবে। সবই আমার কর্ম্মফল মা, সব আমারই পাপের শাস্তি।"

কোঁচার খুঁটে চক্ষু জল মুছিয়া অক্ষয় বাবু অন্যমনস্কভাবে বসিয়া রহিলেন। লক্ষ্মী বলিল, "ওকি বাবা চুপ করে বসে রইলে কেন? এখন যে তোমার কিছু খাওয়াই হ'ল না।"

"হ্যাঁ মা, এই যে খাই। যখন জীবনের অগ্রপশ্চাৎ সমস্ত ভাবি লক্ষ্মী, তখন ক্ষিদে তেষ্টা সমস্ত ভুলে যাই। শুধু মনে হয় আর কত দিন এ ভার বয়ে মরব।"

"ওকি বাবা, সবই তো পড়ে রইল, জল খাচ্চ কেন? পেঁপেটা খুব মিষ্টি, খাও। আর একটু বেল এনে দেব?"

"না মা আর কিছু আনতে হবে না। শুধু তুইই আমার কাছে কাছে থাকিস লক্ষ্মী। শেষ জীবনে পৃথিবীতে আমি আর কিছু চাই না?"

"কেন মিছি মিছি ভেবে শরীর খারাপ কর বাবা? যা হবার তা হবেই। মানুষের হাত কতটুকু?"

"সবইতো মানুষেরই হাত মা। আমাদের

জীবনকে আমরাই তো কষ্টের করে তুলি। অদৃষ্টের নামে দোষ দিলে হবে কেন মা ?"

"বাবা মানুষের হাত শুধু কর্ত্তব্য পালনে, ফলাফল তো মানুষের হাতে নয় "

"ঐ কর্ত্তব্যই তো জীবনের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন জিনিস মা। কটা লোকে সঠিক ভাবে তা পালন করতে পারে। যেখানে তার লঙ্ঘন সেইখানেই অনুশোচনা, কষ্ট, স্মৃতির দংশন !"

দুধের বাটীটা সবে মাত্র অক্ষয় বাবু মুখের কাছে ধরিয়াছেন এমন সময় চপলা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল, ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "বাবা হয় তোমার আদরের মেয়ে লক্ষ্মী এখানে থাক, আমি যাই, আর নয়তো ও যাক্ আমি থাকি।"

দুধ না পান করিয়াই বাটীটা নামাইয়া রাখিয়া অক্ষয় বাবু বলিলেন, "তুমিই কি আমার কিছু কম আদরের মা ? কি হয়েছে ? অত-রাগ করেচ কেন ?"

"ওসব তোমার মুখের কথা বাবা। তুমি লক্ষ্মীকেই বেশী ভালবাস। কেন আজ ও প্রকাশকে অমন করে অপমান কল্লে, আমার সামনে, আরও পাঁচজনের সামনে ? এতে তোমার অপমান বোধ হয় না।"

"সমস্তই আমি শুনেচি মা। সুরেনকে অমন করে বিদ্রুপ করাটাও তোমাদের ভাল হয়নি চপলা।"

"ও—আগে থেকে বুঝি তোমার কাছে সব গেয়ে রাখা হয়েছে। ওর পেয়ারের সুরেনকে—বাধা দিয়া লক্ষ্মী বলিল "দিদি তুমি বাবার সামনে কথা বলচ, প্রকাশ বাবুর সামনে বলচ না, একটু মুখ সামলে কথা বল।" চপলা ইহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া গেল, বলিল, "দেখচ বাবা তোমার সামনে তোমার আদুরে মেয়ের কথা শুনচ ? সুরেনকে যদি ঠাট্টা করেই কোন কথা বলা হয়ে থাকে, তাতে এমনই কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে। সেই জন্যে লক্ষ্মী আজ প্রকাশকে আর তার বন্ধুদের এমন অপমান কল্লে যে তারা ঘৃণায় আমার বাড়ী থেকে চলে গেল।"

লক্ষ্মী বলিল, "এখনই এসব কথা গুলো কি তোমার না বল্লে চলছিল না দিদি, না হয় বাবার খাওয়া হয়ে গেলেই বলতে ?"

চপলা বলিল, "আর থাক তোমায় শিক্ষা দিতে হবে না। বাবা, আমি এর বিচার চাই।"

অক্ষয় বাবু আর না খাইয়া উঠিয়া পড়িলেন। লক্ষ্মী তাড়াতাড়ী বলিয়া উঠিল, "কিছুই যে তোমার খাওয়া হল না বাবা ? ছিঃ ছিঃ দিদি তুমি কি।"

অক্ষয় বাবু শয্যার উপর বসিয়া বলিলেন, "সন্ধ্যা বেলায় তোমার ভায়ের কীর্ত্তি শুনে

আমার পেট অনেকটা ভরে গিয়েছিল যা বাকী একটু যা খালি ছিল তোমার দিদির কথা শুনে তাও ভরে গেল।" চপলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ কি বলছিলে মা, ঠাট্টার কথা? তা প্রাণ নিয়ে ঠাট্টা করা কি ভাল মা? সুরেনের হৃদয়ে আঘাৎ দিয়ে ঠাট্টা করা তোমাদের ভাল হয় নি। তোমার বয়স হয়েচে বুদ্ধিমতী তুমিই, তুমিই কেন এটা বিচার করে দেখ না!"

"তোমার উপদেশবাণী শুনতে এখানে আসিনি বাবা। আমি চাই এ অপমানের প্রতিকার। যদি প্রতিকার কিছু না কর, বল আমি এক্ষুনি এবাড়ী ছেড়ে চলে যাব।"

"বাড়ী ছেড়ে কোথায় যাবি মা? এরও প্রতিকার আমি করব। উঃ লক্ষ্মী পাখাটা কোথা মা? বড্ড মাথাটা কেমন কচ্চে।" লক্ষ্মী তাড়াতাড়ী পাখা আনিয়া পিতাকে বাতাস করিতে লাগিল। চপলা বলিল "করব বল্লে চলবে না বাবা, এক্ষুনি কত্তে হবে।"

লক্ষ্মী বলিল "তোমার পায়ে পড়ি দিদি, একটু চুপ কর, দেখচ বাবার কষ্ট হচ্চে।" লক্ষ্মীর কথা না শুনিয়া চপলা পুনরায় বলিল, "বাবা, চুপ করে রইলে কেন উত্তর দাও।" অতি কষ্টে অক্ষয় বাবু উত্তর করিলেন, "একটু অপেক্ষা কর মা, বুকের ভেতরটা কি রকম কচ্চে।" লক্ষ্মী বলিল, "দিদি, আমার যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে আমায় ক্ষমা কর, কাল আমি প্রকাশ বাবুর কাছ থেকেও ক্ষমা চাইব। বাবাকে একটু মুক্তি দাও।" অক্ষয়বাবু কন্যাকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "মা, মা লক্ষ্মী আমার।" অক্ষয় বাবু মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। লক্ষ্মী তাড়াতাড়ী বলিয়া উঠিল, "দিদি শিগ্‌গীর একটু জল নিয়ে এস!

কিন্তু পিতা মূর্চ্ছিত হইবা মাত্র চপলা সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে অক্ষয় বাবুর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। পার্শ্বে লক্ষ্মীকে একাকী দেখিয়া বলিলেন, "চপলা কোথায় গেল মা?"

"দিদি অনেকক্ষণ চলে গেছে বাবা।" অক্ষয় বাবু একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন মাত্র।

কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মী বলিল, "বাবা"

অক্ষয় বাবু কন্যার হাত নিজের হাতের ভিতর লইয়া বলিলেন, "কি মা?"

"আমিই তোমার আজকের মন কষ্টের কারণ বাবা, আমায় ক্ষমা কর।" লক্ষ্মী কাঁদিয়া ফেলিল।

অক্ষয় বাবু কন্যাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন "তুমি কেন কারণ হবে মা? সবই আমার অদৃষ্ট। ছিঃ মা কেঁদ না।"

কিছুক্ষণ পরে অক্ষয় বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই খেয়েচিস্ লক্ষ্মী ?" পিতার স্কন্ধের উপর মাথা রাখিয়া লক্ষ্মী বলিল, "খাব না বাবা ক্ষিদে নাই।" ধীরে ধীরে কন্যাকে উঠাইয়া অক্ষয় বাবু বলিলেন, "তা কি হয় মা। পাগলামী করিসনে। যা পারিস একটু খেয়ে নে।"

"তোমার যে এখন খাওয়া হয় নি বাবা। তুমিও খাবে বল।

কন্যাকে অক্ষয় বাবু বিলক্ষণ চিনিতেন। তিনি অন্ততঃ খাইতে না বসিলে লক্ষ্মী কখনও খাইবে না, ইহা তিনি জানিতেন। সুতরাং বলিলেন "আচ্ছা চল মা দুজনে এক সঙ্গেই খাইগে।"

খাইতে বসিয়া বলিলেন, "চপলাও বোধ হয় এখন রাগ করে খাইনি মা! তাকে ডেকে নিয়ে আয়, সবাই এক সঙ্গে খাই। মণ্টুকেও ডেকে নিয়ে আয়।"

লক্ষ্মী বলিল, "দিদি অনেকক্ষণ খেয়ে শুয়ে পড়েচে বাবা তার ঘর বন্ধ। দাদা বাড়ী নাই। অনেক রাত হয়ে গেছে বাবা খেয়ে নাও। তুমি ওসব না খেলে আমি খাব না।

অক্ষয় বাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "চপলা খেয়ে শুয়ে পড়েচে? মণ্টু বাড়ী নেই? এত রাত্রে সে কোথায় গেল?"

"এমন সময় দাদাতো কোন দিনই বাড়ী থাকেন না বাবা। চুপ করে বসে রইলে কেন, খাও।"

"হ্যাঁ এই যে মা, খাই। এমন সময় মণ্টু বাড়ী থাকে না? তুই একবার যা লক্ষ্মী চপলাকে ডেকে নিয়ে আয়। সে নিশ্চই আমার উপর অভিমান করেচে।"

"অনেক বার ডাকাডাকি করেছি বাবা। দিদি উত্তর দেয়নি। একবার শুধু বল্লে, তোমার বাবাকে বল গে যাও আমি যেতে পারব না।"

"কি বলেচে মা? চপলা কি বলেচে?"

নিজের খাওয়ার কথা না বলিলে অক্ষয় বাবু অনর্গল বকিয়া যাইবেন ভাবিয়া লক্ষ্মী বলিল, "দিদি কিছু বলেনি। তুমি শিগ্‌গির শিগ্‌গির খেয়ে নাও না আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি?"

অক্ষয় বাবু আর কিছু না বলিয়া আপন মনে খাইয়া যাইতে লাগিলেন। তাহার খাওয়া হইয়া গেলে তাঁহাকে শোয়াইয়া, যা পারিল লক্ষ্মী পিতার পাতে বসিয়াই খাইয়া লইল।

ক্রমশঃ।

কলিকাতায় অদ্ভুত জুয়াচুরি

"লেবারার্স ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড"

রহস্যপূর্ণ কাহিনী!

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীঅমূল্যচরণ মিত্র।

মফস্বলের প্রত্যেক জেলার জন্য District Organisers নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ায়, এককালীন নগদ ৫০০৲ টাকা অগ্রিম জমা রাখিয়া ১০০৲ এক শত টাকা মাসিক বেতন পাইবার আশায় অনেক কর্ম্মপ্রার্থী Telegraphic Money order করিয়াও টাকা পাঠাইয়াছে। দিন কতকের জন্য Bharat Service Securing Agencyর একাদশ বৃহস্পতির যোগ আসিয়া জুটিয়াছিল। এমন সহজ উপায়ে অল্পদিনের মধ্যে প্রভূত টাকা উপায় করিবার মতলব আর কোনও ঐ শ্রেণীর চাকুরি সংগ্রহের আড়কাটি বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে নির্ণয় করিতে পারে নাই। এই ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহারা অগ্রিম ৫৫৬৲ টাকা এককালীন জমা দিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেককে যে নিয়োগপত্র স্বয়ং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছিলেন তাহার নমুনা নিম্নে দিলাম।

Appointment Letter.
The Labourers' Union Bank
Post Box No. 2284
Mg. Director—D. N. Mazumdar,
M.A., M.R.A.S.
21, Canning Street,
Calcutta, ...192 .

To

He is hereby appointed an Asst. Organiser of the Labourers' Union Bank Ltd. on a monthly pay of Rs. 75 plus a fixed allowance of Rs. 25. He must abide by the rules applied to the employees of the Company. He will be in charage of......district.

For the Labourers' Union Bank Ltd.
(Sd.) D. N. Mazumdar,
Managing Director.

উক্ত ব্যাঙ্কের কার্য্যকাল ৬।৭ মাস পূর্ণ না হইতে হইতেই চতুর্দ্দিক হইতে পাওনাদারগণ আসিয়া ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে উত্যক্ত করিতে আরম্ভ করিল; কর্ম্মচারিবৃন্দের ও

কথাই নাই! পুরাতন লোকগুলিকে পাছে মাহিনা দিতে হয় এজন্য তাহাদিগের উপর নিম্নলিখিত মর্ম্মে নোটিশ জারি করিয়া তাহাদের কর্ম্মচ্যুত করা হইল।

Labourers' Union Bank Ltd.
21, Canning Street,
Calcutta, the 15th June, 1924.

To
Asst. Organiser.

Dear Sir,

You are hereby informed that you have up to date done no material work and disposed of no shares of the Company. Please note that unless you can compensate your work by disposing of at least 100 shares within a fortnight, the Company is not bound to pay you any more

Yours faithfully,
(Sd.) R. K. Talukdar,
Managing Director.

১৯২২ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি হইতে সার্ভিস সিকিউরিং এজেন্সির আয়ে ভাঁটা পড়ায় রেবতীকান্ত তালুকদার ব্যাঙ্কের সহকারী ম্যানেজিং ডাইরেক্টররূপে কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু উল্লিখিত নোটিশ গুলিতে তিনি খোদ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বলিয়াই সহি করিয়াছিলেন। পাওনাদাররা তাগাদা করিয়া করিয়া যখন হার মানিয়া গেল, তখন মিঃ ডি, এন, মজুমদার গা আড়াল দিলেন। মিঃ তালুকদার তাঁহার স্থানে কাজ করিতে লাগিলেন। মজুমদারের অনুপস্থিতিতে কর্ম্মচারিদের মনে ক্রমেই সন্দেহ বাড়িতে লাগিল তখন খুব হোঁৎকা রকমের ইয়া তেরিয়া জোয়ান একজন পাঠান জাতীয় দরওয়ানকে নিযুক্ত করিয়া ব্যাঙ্কের প্রবেশ দ্বারের সামনে একটা উঁচু টুল দিয়া ১১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত বসাইবার ব্যবস্থা হইল। এই নব নিযুক্ত দরওয়ানের উপর এরূপ কড়া হুকুম দেওয়া হইল যে নির্দ্দিষ্ট কয়েকজন লোক ব্যতিত আর কাহাকেও যেন দরজায় মাথা গলাইতে না দেওয়া হয়। পাওনাদারগণ বেগতিক দেখিয়া আর ত্রিসীমানায় গেল না। ভাড়া করা আসবাব পত্র যাহা মাস কয়েকের জন্য রাখিয়া লোকের মন ভুলাইয়া ছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে সরাইয়া ফেলা হইল— রহিল কেবল কাউণ্টার এবং খান কতক ভাঙ্গা চেয়ার, তাহাদের মধ্যে আবার কতকগুলির বেতের ছাউনি উড়িয়া গিয়াছে এবং ছারপোকায় থিক্ থিক্ করিতেছে—আর ২।৩ খানি পায়া ভাঙ্গা টেবিল। কাউণ্টারে যে দুই জন কর্ম্মচারি ব্যাঙ্কের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আঁকড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা মিঃ মজুমদারের আত্মীয়।

মজুমদার কাহারও কাহারও বেতন, জমার টাকা মিটাইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়া যখন আর ভাঁড়া ভাঁড়ি করিলে চলিবে না ভাবিল, তখন কোনও কোনও লোককে Co-operative Hindusthan Bankএর উপর চেক্ কাটিতে লাগিল কিন্তু প্রত্যেক চেকই অন্ততঃ ১৫ দিন পরে উপস্থিত করিতে হইবে এইরূপ ভাবে তারিখ বসাইয়া দিল, বলা বাহুল্য মজুমদারের নিজ নামে উক্ত Hindusthan Bankএ যৎসামান্য যাহা জমিয়াছিল, তাহা বহু পূর্ব্বেই উঠাইয়া লইয়া ছিল।

মজুমদারের একজন পরামর্শদাতা ছিলেন। ইনি ব্যাঙ্কের অন্যতম মালিক এবং হাইকোর্টের এটর্ণি মহলের একজন বাস্তুঘুঘু; এজন্য পাট-ওয়ারি বুদ্ধিতে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কেহ নালিশ করিব বলিয়া শাসাইলে বা ভয় দেখাইলে, এই সব-জান্তা আইনজ্ঞ লোকটী তাহাকে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিতেন। মজুমদার যখন পাওনাদের ভয়ে লুকাইয়া বেড়াইতে লাগিল তখন তালুকদার এবং এই আইনজ্ঞ লোকটি ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। এই সময়ে কর্ম্মচ্যুত ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারিরা দলবদ্ধ হইয়া সার্ভিস্ সিকিউরিং এজেন্সি মারফত যাহাতে আর কোনও লোক নিযুক্ত না হয়, সে জন্য কতক ২১ নং ওল্ড কোর্টহাউস্ ষ্ট্রীটে এবং কতক লোক ২১ নং ক্যানিং ষ্ট্রীটের নীচের তালায় দ্বার দেশে সমবেত হইয়া কর্ম্মপ্রার্থীদিগকে সাবধান করিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু চাকুরির এমন মোহ যে কর্ম্মপ্রার্থীরা কোন গুপ্ত স্থানে যাইয়া তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিত। কর্ত্তারা যে যখন সুযোগ পাইত, সেই হাত মুঠা লইতে ত্রুটি করিত না। এই ধাঁকতির বাজারে একজন নূতন কর্ম্মপ্রার্থী আসিলে, পুরাকালের রাক্ষস রাক্ষসীর মত তাহাকে ইহারা আদর আপ্যায়নে মোহিত করিয়া নিজেদের কার্য্যোদ্ধার করিতে লাগিল কিন্তু মজুমদার ইহাদের মধ্যে শিক্ষিত ডাকাত সে নিজের বিপদ সম্মুখিন ভাবিয়া সকল পাওনাদারকেই অক্টোবর ১৯২২, পূজার ছুটীর পরে নিশ্চয়ই টাকা মিটাইয়া দিবে বলিয়া কড়ার করিতে লাগিল। তাহার করুণ দৃষ্টি এবং নম্রতাপূর্ণ কথা শুনিয়া অনেকেই পূজার ছুটীর পর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে সম্মত হইল। আর তাহা না করিয়াই বা উপায় কি? টাকার জন্য নালিশ রুজু করিতে হইলে প্রথমে পকেট হইতে বাহির করিতে হইবে; তাহার পর যদিই ডিক্রিই হয় তাহাতেই বা কি হইবে? ব্যাঙ্কের ত এক কপর্দ্দক নাই—ডাইরেক্টরগণ ব্যাঙ্কের চেহারাটা পর্য্যন্ত কখনও দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

(ক্রমশঃ)

মালবিকা

(শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য)

তৃতীয় দৃশ্য।

(রাজ প্রাসাদের অন্তঃপুরস্থ মন্ত্রণা গৃহ)

রাজা অগ্নিমিত্র, মহারাণী ধারিণী, বিদূষক, পণ্ডিতকৌশিকী, ও আচার্য্যদ্বয় আসীন। দূরে কঞ্চুকী দণ্ডায়মান।

রাজা—ভগবতি! এই মাননীয় আচার্য্যদ্বয়ের এক কলহ উপস্থিত হয়েছে! আপনাকে এর মীমাংসা করতে হবে।

কৌশিকী—সে কি মহারাজ! নগর থাকতে কিনা শেষে গণ্ডগ্রামে রত্ন পরীক্ষা? আপনি থাকতে আমার দ্বারা বিচার? মহারাজ সন্ন্যাসিনীকে বৃথা লজ্জা দেবার ইচ্ছা জাগল কেন?

রাজা—আপনি সন্ন্যাসিনী আমাদের পক্ষপাত দোষ থাকতে পারে কিন্তু আপনার তা' নেই। তাই একথা বলতে সাহসী হয়েছি।

আচার্য্যদ্বয়—মহারাজ যুক্তি সঙ্গত কথা বলেছেন।

রাজা—তবে বিচার আরম্ভ হোক। এ বিষয়ে দেবীর মত কি?

ধারিণী—আমার মতে এদের বিবাদ করা উচিত নয়। দুজনেই খুব নিপুণ অভিনেতা।

গণ—দেবি! "গণদাস ও হরদত্ত দুজনে সমান" একথা বলে আপনি আমার অপমান করবেন না। আপনিও যদি বিমুখ হন তবে গণদাসের মৃত্যুই শ্রেয়।

বিদূ—এ দুটোই দেখছি ভয়ানক স্বার্থপর আর হিংসুটে। এদের বিবাদের মীমাংসা দেখতেই হবে। নয়ত, এদের মিছামিছি মাইনে দিয়ে লাভ কি? কি বলুন মহারাজ! হা! হা! হা!

ধারিণী—ব্রাহ্মণ তুমি ত ভারি ঝগড়াটে দেখছি।

বিদূ—(সসম্ভ্রমে) রাম! রাম! একথা মনেও করবেন না রাণী-মা; তবে কিনা, যখন ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই বাঁধে তখন একটার না একটার হারজিত না হলে ত আর গোলমাল চোকে না। তাই বলছি এদের একটা বিচার হওয়া ভাল।

রাজা—তবে মীমাংসা আরম্ভ হোক্। আপনাদের কার কি বক্তব্য আছে বলুন।

কৌশিকী—মহারাজ! নাট্য শাস্ত্র প্রয়োগের

উপর নির্ভর করে। সুতরাং বাদানুবাদের প্রয়োজন কি ?

রাজা—তা আপনি ত এঁদের প্রত্যেকেরই অভিনয় দেখেছেন।

কৌ—হাঁ। কিন্তু আরও একটা কথা আছে কেউ কেউ নিজে ভাল অভিনয় কর্‌তে পারেন, কেউ কেউ বা শিষ্যদের উত্তম শিক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু এই দুই বিষয়েই যিনি সম্যক পটু তিনিই শ্রেষ্ঠতর! এখন দুজনার নিজস্ব অভিনয় না দেখে ওঁদের শিষ্য কৃত অভিনয় দেখ্‌তে ইচ্ছা করি।

উভয় আচার্য্য—ভগবতীর আজ্ঞাই শিরোধার্য্য।

ধারিণী—কিন্তু শিষ্য যদি দুর্ম্মেধা হয় ? তবে তার দোষ ত গুরুকে অর্শাতে পারে না। সুতরাং শিষ্যের অভিনয় দেখে গুরুর ক্ষমতা পরীক্ষা করা আমার মনে নিতান্ত অনুচিত। ভগবতী কি বলেন।

রাজা—এখানেই ত উপদেশ দেওয়ার বাহাদুরী।

বিদূ—ঠিক্, ঠিক্, গাধা পিটে ঘোড়া না কর্‌তে পার্‌লে আর মাষ্টারের নাম বেরুবে কি করে ? মহারাজ যখন আমরা পাঠশালে লিখ্‌তাম...

ধারিণী—(সোদ্বেগ সহকারে) আচার্য্য গণদাস আপনি একাজ কখন কর্‌বেন না।

বিদূ—আহা! রাণী মা যা বলেন, তার একটুও অযুক্তি সঙ্গত নয়। ওহে গণদাস! বিদ্যে ত তোমার সব আমার জান্‌তে বাকী নেই তুমি সঙ্গীত চর্চ্চার মাহাত্ম্যে রোজ রোজ সরস্বতীর প্রসাদ স্বরূপ অতি উত্তম সন্দেশ উদরস্থ করে, কেন মিছে শুক্‌নো ঝগড়া ক'রে, বিদ্যে দেখাতে গিয়ে সে সুখটুকু হারাবে। ব্রাহ্মণের কথা না শুন্‌লে পরে পস্তাতেই হবে। তখন বুঝবে যে গরীবের কথা বাসী হলে মিষ্ট লাগে। (স্বগতঃ) নারদ! নারদ! লেগেজা যে নারদ ঝটাপটি।

ধারিণী—আপনার শিষ্যা মালবিকা অতি অল্পদিন মাত্র অভিনয় শিখছেন। এখনো তেমন সুদক্ষা অভিনেত্রী হয়ে উঠতে পারেন নি। এ অবস্থায় আপনি তাঁকে আচার্য্য হরদত্তের সুদক্ষ শিষ্যগণের বিপক্ষে নামাতে চেষ্টা কর্‌বেন না।

গণ—দেবি! মালবিকা অল্পকালেই কিরূপ দক্ষা হয়েছেন তাই দেখাতেই আমার আজ এত আগ্রহ। আপনি যদি এ বিষয়ে আমায় অনুমতি না দেন তবে জান্‌ব আপনি আমায় ত্যাগ কর্‌লেন। (দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ও আসন হইতে উঠিবার চেষ্টা)

ধারিণী—(অভিমানে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) তবে তাই হোক্। আপনি আপনার শিষ্যাকে নিয়ে যথেচ্ছা ব্যবহার কর্‌তে পারেন। আমার আর তাতে আপত্তি কি ?

গণদাস—আজ আমি ধন্য হলাম। এখন আপনারা আজ্ঞা করুন, কোন্ নাটক অভিনয় হইবে।

রাজা—ভগবতী কৌশিকী যেমন আজ্ঞা করেন, তেমনি হবে। তাঁর মতেই আমার মত। (স্বগতঃ) হৃদয় উদ্বেল হইও না, তোমার অভিলাষ সত্য সত্যই পূর্ণ হ'তে চল্‌ল।

কৌ—দেবীকে এত বিষণ্ণ দেখছি কেন ? আমার ভয় হচ্ছে—

ধারিণী—না না, আমার সম্বন্ধে কোন চিন্তা নাই। আপনার অভিমত প্রদান করুন।

কৌ—মহারাজ ! শর্ম্মিষ্টার রচিত চতুষ্পদী-যুক্ত ছলিক নাটকের অভিনয় করা দুঃসাধ্য বলে শুনা যায়। অতএব এই নাটকেরই অভিনয় দেখ্‌তে ইচ্ছা করি।

উভয় আচার্য্য—যে আজ্ঞা ভগবতি।

(হরদত্তের উত্থান, কিন্তু গণদাস ধারিণীকে দেখিতে লাগিলেন)

ধারিণী—(গণদাসের দিকে চাহিয়া, লজ্জা-ভিমানজড়িত স্বরে) আর্য্য ! আপনি জয়ী হোন এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। ভগবান বোধ হয় এ ইচ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন।

(গণদাসের উত্থান)

(বিদূষকের অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ)

বিদূ—দেখুন, আপনারা গিয়ে সব ঠিক ঠাক্ করেই আমাদের খবর দেবেন। আর খবর দেবারই বা দরকার কি ? বাজনার শব্দ শুন্‌লেই আমরা গিয়ে হাজির হব।

উভয় আচার্য্য—(হাস্য) যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান)।

(ক্রমশঃ)

স্বর্গনরক ভোগের সংশ্লেষ

(শ্রীরামদয়াল বেদান্ত শাস্ত্রী)

এক বৎসরের মধ্যে হউক বা পরেই হউক, পারলৌকিকার্থ পুণ্যকারী ব্যক্তিরা স্বর্গে, অত্যুৎকট পাপকারী ব্যক্তিরা নরকে গমন করে। স্বর্গ নরক ভোগ যে সূক্ষ্ম দেহে হয়, তাহার নামই ভোগদেহ ; মৃত্যুর পর পরলোকে যে ভোগ, তাহা সংকল্প মূলক মানসিক। পারলৌকিক

সুখদুঃখ স্বপ্ন জাত সুখদুঃখবৎ। অনুভূতি হিসাবে জগৎ স্বপ্নবৎ; পার্থিব আর অপার্থিব ভোগে প্রকৃত পার্থক্য নাই।

এক বৎসরের মধ্যে যাহারা (সাধারণ পুণ্য পাপকারী ব্যক্তি) ভোগ-দেহ প্রাপ্ত হয় না; তাহারা সাধারণ লিঙ্গ-দেহে—ছায়াদেহে, স্মৃতি শাস্ত্রের মতে প্রেতদেহে (ভৌতিক যোনিতে নহে) বাস করে মাত্র, সে লিঙ্গদেহে কৃত পাপপুণ্যের ক্ষয় হয় না। তাহা হাজত বাসের মত, তাহাতে বিচার দণ্ডের হ্রাস পায় না। লিঙ্গদেহে ছায়াদেহে সাধারণ পুণ্য পাপাত্মিকা প্রকৃতি, পাপময় সংস্কার থাকে মাত্র।

যে পুণ্য ইহলোকে, জন্মান্তরে উপভুক্ত হইতে পারে না, স্থূলদেহে যে পুণ্যের ভোগ সম্ভব নহে, মাত্র পরলোকের ভোগ হইয়া থাকে—তাহাই পারলৌকিকার্থ ভোগ। পারলৌকিকার্থ পুণ্য স্বর্গে নিঃশেষেই ভোগ হয়—তাহার, ভুক্তাবশেষ কিছু থাকে না। তবে ঐহিকার্থ পুণ্য যাহা স্থূলদেহে ইহলোকে বা জন্মান্তরে উপভুক্ত হইতে পারে, তাহার ফলই জীব জন্মান্তরে ভোগ করে, স্বর্গ কেহ মানুন বা নাই মানুন সে ব্যক্তি অনুরূপ পুণ্য সাধন করিলেই পারলৌকিক সুখ লাভ করিবেই। যাদৃশ সাধন, ফলও তাদৃশ হইয়া থাকে। কেহ যদি স্থূলদেহে 'যাহা সম্ভব নহে' এমন আকাঙ্ক্ষা করিয়া তদনুরূপ পুণ্য সাধনা করিয়া যায় তাহা হইলে সে ব্যক্তি সে সাধনার ফল সূক্ষ্ম দেহে মানস ভোগেই প্রাপ্ত হইবে। ভোগে অবসাদ অতৃপ্তি ও জ্বালা থাকিবে না; ইত্যাদি রূপে ভোগাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির (অবশ্য পুণ্য সাধনা করিয়া গেলে) মানস ভোগ ব্যতীত সে সাধ স্থূলদেহে মিটিবার সম্ভাবনা নাই।

পারলৌকিকার্থ কি? পরলোক উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত অথবা পরলোক ভোগ প্রাপক পুণ্যই পারলৌকিকার্থ পুণ্য। সেই পুণ্যকারী ব্যক্তি পুণ্যানুরূপ ফল স্বর্গভোগ করত পশ্চাৎ জন্ম হেতু স্থাবর সংশ্লেষ প্রাপ্ত হয়। স্থাবর বা শস্য সংশ্লেষ জন্মের দ্বারা পুণ্যকারী এবং পাপকারী সকলেরই নিয়তি, সংশ্লেষ লাগিয়া থাকা মাত্র। সে সংশ্লেষে জীবের চেতনা সংমূর্চ্ছিত থাকে। শস্যাদির ছেদনে বা ভেদনে তৎসহ শস্যসংশ্লেষিত জীবের কোন কষ্ট অনুভূত হয় না। স্বর্গভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যক্ষয়ের সঙ্গে যেমন ভোগদেহ হইতে প্রচ্যুত হয়—অমনই সংমূর্চ্ছিতবৎ অচেতন থাকিয়া বায়ু তদাত্ম লাভ করে পশ্চাৎ বৃষ্টি ধারার সহিত জলে স্থলে তরুলতা মূলে ঔষধিতে পতিত হইতে আরম্ভ করে। তখন তাহাদের সূক্ষ্ম জীবাত্মা আকার। মহাপাপীদের মহাপাপের

ফলে যে ভৌতিক যোনি লাভ ঘটে তাহা ভৌতিক জন্ম। যোনি জন্ম, স্থাবর সংশ্লেষ আর স্থাবর যোনি এক জিনিষ নহে।

দেবযান-মার্গে যাহারা যায় তাহারা পুণ্যফল ভোগ করতঃ ফিরিয়া আইসে; কেহ বা ক্রম মুক্তি লাভও করে, কেহ বা শান্তিময় স্বর্গে বহুকাল দেবতা সদৃশ হইয়া থাকিয়া যায়, নিষ্কাম কর্ম্মকারী উত্তম প্রকৃতি সম্পন্ন; পারলৌকিকার্থ পুণ্যকারী মানবাত্মারাই দেবযানমার্গে গমন করে। পিতৃযান মার্গে যাহারা যায়, তাহারা মর্ত্তে ফিরিয়া আসিতেই বাধ্য হয়। কেহ ভোগময় স্বর্গে কিয়দ্দিন সুখ প্রাপ্ত হয়, কেহ বা দেবতাদের ভোগ্য হইয়াই ভোগ সুখ অনুভব করে। সকাম কর্ম্মকারী, ভোগ সুখময় যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠাতা ব্যক্তিরাই পিতৃযান মার্গের অধিকারী। দেবযানমার্গে গাম্য ব্যক্তি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যোগৈশ্বর্য্য কুলে অন্যান্য জ্ঞানোজ্জল ব্রাহ্মণের গৃহে, বা উৎকৃষ্ট বিভূতি যুক্ত গৃহে জন্ম লয়। পিতৃযান গাম্য ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়া ভোগী ধনীর পুত্ররূপে শরীর ধারণ করে।

স্বর্গের পতনকালে স্বর্গভ্রষ্ট ব্যক্তির স্বর্গের স্মৃতি বা সংস্কার লইয়া ফিরে না। যতদিন পুণ্যফল, ততদিনই স্বর্গসুখ সুমধুর, যেমন পুণ্যক্ষয় হইয়া আইসে, সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গের উপর তাহাদের মোহও ক্ষীণ হইয়া আইসে, আকর্ষণ ও কম হইতে থাকে। মর্ত্ত্যের দুঃখ না থাকায় দুঃখের স্মৃতি পাশাপাশি না থাকায় স্বর্গের সে নূতনত্ব, বৈচিত্র্য এবং মাধুর্য্য থাকে না, তাহা এক ঘেয়ে এমন কি শেষে কারাবাসের মত দুঃসহ হইয়া উঠে। তখন মর্ত্তের সুখ দুঃখ আবার স্পৃহনীয় বলিয়া বোধ হয়, স্বর্গভ্রষ্ট হইবার পূর্ব্বে কোন দুঃখ ত অনুভূত হয়ই না; বরং সুখ, তৃপ্তির স্বস্তি বোধ হইয়া থাকে, স্বর্গ ভোগের স্মৃতি লইয়া জীব যদি মর্ত্ত্যে আসিত, তবে তাহার স্বর্গভ্রংশ এবং স্থাবর সংশ্লেষাদি কি দারুণ যাতনাপ্রদ হইত। তাহা হইলে কি পুণ্যবান কি পাপী, সাধারণ ব্যক্তি কেহই স্বর্গ চাহিত না। ভিখারীর কিছুদিন রাজভোগ খাওয়ার মত বিড়ম্বনা মাত্র সারই হইত।

মোট কথা, ইহলোকে যাহারা কর্ম্ম করিয়া থাকে বা এই প্রকার আমার দেহ ছিল—ইত্যাকার সংস্কার লইয়া প্রস্থান করে না তাহারা ছায়া দেহ বা প্রেতদেহ প্রাপ্ত হয় না। সংস্কার মূলকই ছায়া বা প্রেতদেহ। সে কাহার? যথা শিশুগণ, উন্মত্ত জড় ব্যক্তিগণ, যাহারা সাধারণ পুণ্য পাপকারী,—পারলৌকিকার্থ পুণ্য করে উৎকট পাপ করে তাহারাই এক বৎসরের মধ্যে বা পরে ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়। ছায়াদেহ বা প্রেতদেহ সমস্তই অপার্থিব, সূক্ষ্মদেহ মাত্র। সমস্তই লিঙ্গ দেহেরই প্রকার ভেদ মাত্র।

পরলোকের পরিচয়

(শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ।

২। মৃত্যু বা পরিবর্ত্তন।

শশ্মানভূমে প্রাণহীন জড়দেহের ধ্বংস হইয়া থাকে। যাহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়, লোকে তাহার মৃত্যু হইল এইরূপ সাব্যস্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, রাম, শ্যাম কি হরিচরণের মৃত্যু হয় না, তাহাদের জড়দেহের পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। লোকে ভাবে, রাম, শ্যামের জড়দেহের ধ্বংস হইলে সব ফুরাইল, আর বুঝি উহাদের কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে না মৃত্যুকে, এইরূপে মানবজীবনের শেষ সীমা ভাবিয়া, সমাজ যে কি ভয়ানক ভ্রমে পতিত হইয়াছে, তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ হয় না। যদি লোকে মৃত্যু-রহস্য অবগত হইতে পারিত, যদি মৃত্যুকে একটা অবস্থান্তর জড় হইতে সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন মাত্র বিবেচনা করিতে পারিত, যদি মৃত্যুর পর অনন্ত জীবন আছে ও সেই জীবনে, ইহজীবনের ছায়া-পাত হয়, পার্থিব চরিত্র, প্রবৃত্তি ও বাসনা বশে পরিচালিত হয়, এটুকু বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে জগতে পাপের মাত্রা অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইত, অত্যাচারের স্রোত মন্দ হইয়া আসিত, মধুময় ধর্ম্মজীবনের স্বর্গীয় প্রতিভায় সমাজ সমুজ্জ্বল হইত।

পারলৌকিক তত্ত্বদর্শী লব সাহেব বলিতে-ছেন—"যখন মৃত্যু হয়, তখন মানবচরিত্রের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। মৃত্যু মানবদেহের অবস্থান্তর করিলেও তাহার ধর্ম্মবৃত্তি লোপ করিয়া দেয় না। বা তাঁহার পাপ চিন্তার কলঙ্ক-কালিমা মুছাইতে পারে না। কেবল জড় হইতে সূক্ষ্ম, ইহজগৎ হইতে পরজগতে পরিচালনা করাই মৃত্যুর কার্য্য। যাঁহাদের প্রাণের ভাব উচ্চ, যাঁহাদের আত্মার গতি ঊর্দ্ধমুখ, তাঁহারা মৃত্যু বা সূক্ষ্ম চৈতন্যময় অবস্থায় উপনীত হইলে ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়, আর যাহারা নীচ প্রবৃত্তিবশে বিকৃত বাসনার দাস হইয়া থাকিতে ভালবাসে, তাহারা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে পরজগতে সেই-রূপ নীচ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহজগতে যেমন মানব সমাজে নানাবিধ বৃত্তিধারী, বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বাস করে, পরজগতে সেইরূপ।" লব সাহেব লিখিয়াছেন, "যে সকল মুক্তাত্মার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহারা

বলিয়াছেন, "দেহমুক্ত আত্মা পরজগতে আসিয়া অলসভাবে জীবন যাপন করে না, পরন্তু এখানেও এক বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র বিরাজমান। তবে এখানে ভাবগোপন নাই প্রবঞ্চনা নাই, স্বার্থপরতা নাই।"

অতএব মৃত্যুই এই নবজীবনের জন্মভূমি,—জড়তা, স্বার্থপরতাময় অবস্থা হইতে, সূক্ষ্ম চৈতন্যময় অবস্থা প্রাপ্তি মাত্র। যেমন বসন্ত সমাগমে, শীতের জড়তা ও সঙ্কোচ বিনষ্ট হইয়া শীর্ণ তরু-দেহে নব কিশলয়ের আবির্ভাব হয়, পুষ্পগন্ধে দিক্ আমোদিত হয়, ম্রিয়মাণ প্রকৃতি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় শান্ত সুনির্ম্মল ভাব ধারণ করে, মলয় হিল্লোলে, কুঞ্জনিঃসৃত, বসন্ত-বিহগের কুহুতানে, নব চৈতন্যের বার্ত্তা ঘোষিত হয়,—সেইরূপ মৃত্যুর আলিঙ্গনে, মানুষ নব জীবনের সন্ধান পায়, নবজগতে নবভাবের দেহ ধারণ করে, আত্মার অমরত্ব ও সূক্ষ্ম চৈতন্যের অনন্ত প্রভাব উপলব্ধি করিবার অবসর পায়। অতএব মৃত্যু দুঃখের কারণ নহে—ইহা অনন্ত সুখ লাভের নবীন উপায়, মৃত্যু জীবনের শেষ নহে—নবজীবনের তোরণদ্বার। মৃত্যু, বিভীষিকা নহে —ইহা অনন্ত আশাময়!

উপরে যাহা বলা হইল ইহা কাল্পনিক উপাখ্যান নহে, সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা জড়বিজ্ঞান আলোচনা করিতে করিতে, অবশেষে জড় হইতে সূক্ষ্মের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন, সেই সকল মহা পণ্ডিতেরা এইরূপ অভয়-বাণী প্রচার করিয়াছেন। শুধুই তাহাই নহে, যাহারা আমাদের মত স্থূল দেহ ধারণ করিয়া এককালে এজগতে অবস্থান করিয়াছিলেন, এবং এখন দেহত্যাগ করিয়া পরলোকে সূক্ষ্ম চৈতন্যময় দেহে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে, সাধক বিশেষের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া, মিডিয়মের দেহ-মন আয়ত্ত করিয়া বা সাধন-মণ্ডলে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণের চিন্তা-বিক্ষেপ বলে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেও, মৃত্যু সম্বন্ধে এই ধারণা মনোমধ্যে বলবতী হয়।

মৃত্যুকালে ও মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, মানবের মনে কিরূপ ধারণা হয়, তাহা একটী মুক্তাত্মার মুখে শ্রবণ করুন। লব সাহেবের সমক্ষে এই মুক্তাত্মা আবির্ভূত হইয়া বলিয়াছিলেন—"মৃত্যুর পর, মনে করিয়াছিলাম, বুঝি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রে যেমন ঘোর নিদ্রার কথা লিখিত আছে মহা বিচারের দিন পর্য্যন্ত সেই ভাবে নিদ্রিত থাকিব। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার বিপরীত দেখিলাম। মৃত্যুর পর যখন দেখিলাম

যে আমার আত্মা জড়দেহ হইতে বহির্গত হইয়া আবার ঐ দেহের মত অভিনব সূক্ষ্ম অবয়বাদি প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। জড়দেহ ছাড়িয়াও আবার নূতন দেহ লাভ করিলাম—ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আবার চৈতন্যলাভ হইল। এ বড় রহস্যময়। তখন মনে যে বিস্ময় কৌতুকের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না—সেটা অনুভূতির অন্তর্গত। আবার, যখন দেখিলাম, আমার জড়দেহটা পড়িয়া রহিয়াছে ও আমার পরিজনেরা রোদন করিতেছে, তখন প্রাণে একটু বেদনার সঞ্চার হইল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম, উহারা কেন কাঁদিতেছে, আমি তো মরি নাই। আমি উহাদের দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু উহারা আমায় দেখিতে পাইতেছে না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমার চৈতন্যের পরিবর্ত্তন হইল।"

মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম দেহ কিয়ৎকাল তাহার পরিত্যক্ত দেহ বা পূর্ব্ব আবাসস্থানের নিকট অবস্থান করে। এতকালের আকর্ষণ সহজে ত্যাগ করিতে পারে না। এইজন্য হিন্দুশাস্ত্রে শবদাহের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। সে যাহা হউক মৃত্যুর পর, সূক্ষ্ম দেহধারী মানবাত্মা, কি অবস্থা প্রাপ্ত হয় ও কোথায় গমন করে, এবং এই পরিবর্ত্তনের পরিণাম কি? তাহা লগ সাহেবের সংগৃহীত, পরজগৎবাসীদের আত্মোক্তি হইতে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব।

(ক্রমশঃ)

কামরূপে পাল নৃপতিগণ

(আসাম পর্য্যটক—শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী)

ধর্ম্মপাল।

ধর্ম্মপাল নামধেয় দুইজন প্রসিদ্ধ নৃপতি বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে ১ম ধর্ম্মপাল গৌড়ের পাল রাজবংশের ২য় নৃপতি, এবং অপর জন দণ্ডভুক্ত (গৌড়মণ্ডল?) পতি। দাক্ষিণাত্যের রাজেন্দ্র চোলা ১০১২ খৃঃ অব্দে ঐ দণ্ডভুক্তপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে বঙ্গের রাজা মাণিক চাঁদ ২য় ধর্ম্মপালের ভ্রাতা ছিলেন। তিনি তিলক চাঁদের কন্যা ময়নামতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ময়নামতী নীলকামরী মহকুমার অন্তর্গত ডিমলা থানার

অধীন "আটীয়া থাড়ী" গ্রামে বসবাস করিতেন। তিনি নেপাল বৌদ্ধ-যোগী গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন। ডাক্তার বুকাননের মতে মাণিক চাঁদের মৃত্যুর পর তদীয় রাজ্য লইয়া ধর্ম্মপাল ও ময়নামতীর মধ্যে ঘোর সংগ্রাম হয়। তাহাতে ধর্ম্মপাল নিহত হইলে মাণিকচাঁদের পুত্র গোপিচন্দ্র সিংহাসন প্রাপ্ত হন। গ্রীয়ারসন মহোদয় এই কিংবদন্তীর অস্তিত্ব স্বীকার করতঃ মাণিকচাঁদকে ধর্ম্মপালের প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতি বা সামন্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

লামা তারানাথের গ্রন্থ এবং খলিমপুরে প্রাপ্ত ১ম ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন হইতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করিতেন। মাণিক গাঙ্গুলীর "ধর্ম্মমঙ্গল মতে" ধর্ম্মপালের মন্ত্রী ছিলেন ময়নাগড় রাজ লাউসেন। ৭০৩ শকে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল।" Capt Jenkins বর্ত্তমান আসাম প্রদেশস্থ তেজপুরের সন্নিকটে ধর্ম্মপালের যে—কয়খানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হন, গভর্ণর জেনারেলের এজেন্ট Mr. F. Jenkins ১৮৪০ সালের Jour. A. S. B. তে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক তাম্রশাসনের সহিত গণেশের মূর্ত্তি সংবদ্ধ ছিল। তাম্রশাসনে কোন শকের উল্লেখ নাই—বৎসরের স্থানে স্থানে কেবল "৩৬" এই সংখ্যা উৎকীর্ণ আছে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, "মহারাজ ধর্ম্মপাল ৮৭৫ খৃঃ অব্দ হইতে ৮৯৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন কিন্তু ঐতিহাসিক তারানাথের মতে তাঁহার রাজত্ব কাল ৬৪ বৎসর। এই ধর্ম্মপালের সহিত উপরি উক্ত পাল-বংশীয় রাজগণের কোন সম্বন্ধ নাই। শ্রীযুক্ত এডোয়ার্ড গেইট মহোদয়ের মতে "এই বংশের অন্যতম রাজা ছিলেন রামচন্দ্র। ব্রহ্মপুত্রস্থ মাজুলীদ্বীপের রত্নপুর নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল।" ব্রহ্মপুত্রনদ এই রত্নপুর নগরী উদরসাৎ করিয়া উহার চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়াছে।

ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটপতি "প্রবল" দুহিতা রান্নাদেবী (৪) কে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই রাষ্ট্রকূট কোথায়? প্রাচীনকালে দক্ষিণ মহারাষ্ট্র প্রদেশকে "রাষ্ট্রকূট" বলা হইত। ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল অনুসারে "ধর্ম্মপালের পত্নীর নাম ছিল ভানুমতী (তৃতীয় সর্গ, ৬৫ পৃঃ)। এই ভানুমতীর রঞ্জাবে এক ভগ্নী ছিল, তাঁহার সহিত মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ময়নাগড়ের রাজা কর্ণসেনের পরিণয় হয়। কর্ণসেনের

(৪) রান্নাদেবী—Memoirs of the Assiatic Society of Bengal, Vol iii, P. 20.

পুত্র লাউসেন ধর্ম্মপালের আদেশে বিপুলবাহিনী সহ কামরূপ কর্পূর ধবলকে আক্রমণ করতঃ পরাজিত করেন। কর্পূর ধবল স্বীয় কন্যা কলিঙ্গকে লাউসেনের করে সমর্পণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন; ইত্যাদি।" ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহার এ উক্তিসমূহ কাল্পনিক। কোন ইতিহাসে, আবিষ্কৃত প্রস্তর লিপিতে অথবা প্রাপ্ত তাম্রশাসনে ঐ সকলের কোন পোষকতা পাওয়া যায় না।

"ধর্ম্মপাল" মহারাজ গোপালের ঔরসে ও দোদ্দদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে তিনি রাজ্যলাভ করিয়াই দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। তাম্রশাসনে ধর্ম্মপালকে "বঙ্গপতি" এবং তাঁহার সৈন্যগণকে বাঙ্গালী বলা হইয়াছে। তাঁহার সময়ে মিথিলা বাঙ্গালীর অংশ বিশেষ ছিল।

দেবপাল।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বা কামরূপের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা ধর্ম্মপালের মহারাজ দেবপালের নাম পাই। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে ভাগলপুরে মহারাজ নারায়ণ পাল দেবের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই তাম্রপত্রের প্রতিলিপি ও অনুবাদ স্বীয় মন্তব্যের সহিত প্রকাশ করেন। এই তাম্রশাসনখানি ভাগলপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া "ভাগলপুর লিপি" নামে সুপরিচিত। ভাগলপুরে নারায়ণ পাল দেবের আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ আছে, "জয়পাল তাঁহার অগ্রজ দেবপালের আদেশে উৎকল ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর রাজ্য (বর্ত্তমান কামরূপ) অধিকার করেন। জয়পাল যুদ্ধযাত্রা করিলে উৎকলরাজ দূর হইতে তাঁহার নাম শ্রবণ করিয়াই নিজ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর তাঁহার আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিয়া, আত্মীয়বর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া চিরকাল পরমসুখে বাস করিয়াছিলেন। সেখানে উল্লেখ আছে:—

"যস্মিণভ্রাতুর্নিদেশদ্বলবতিপরিতঃ প্রস্থিতে জেতুমাশাঃ
সীদন্নাম্নৈব দূরান্নিজপুরমজহদুৎকনানামধীশঃ।
আসাঞ্চক্রে চিরায় প্রণয়ি পরিবৃতো বিভ্রদুচ্চেন মূর্দ্ধা
রাজা প্রাগ্‌জ্যোতিষানামুপশমিত-সমিৎ-সংকথাং যস্য চাজ্ঞাম্॥"

এই শ্লোকের দ্বারা উৎকলাধিপতির পরাজয়ের এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতির সহিত সন্ধিবন্ধনের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ চন্দ মহাশয় অনুমান করেন (৫)

(৫) গৌড় রাজমালা, ২৯ পৃষ্ঠা।

"ভগদত্ত বংশীয় প্রলম্বের পৌত্র জয়পাল বাহু সম্ভবতঃ এই সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

রামপাল।

১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক "রামচরিত কাব্য" নেপাল হইতে আনীত হইয়া ১৯০০ খৃঃ অব্দে এসিয়াটিক সোসাইটীর সাহায্যে প্রকাশিত হইবার পরে মহারাজ রামপাল দেবের রাজত্ব-কালের নির্ণয় এবং তৎকালের ঘটনাবলীর বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে।

সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত "রামচরিত" কাব্যের প্রথম অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়—মহারাজ ৩য় বিগ্রহপাল দেবের মহীপাল, শূরপাল ও রামপাল নামক পুত্রত্রয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে "রামপাল" স্বীয় গুণগৌরবে প্রজামণ্ডলীর সমাদৃত ও সিংহাসন পাইবার উপযুক্ত হইলে তদীয় দুষ্টাগ্রজ মহীপাল তাঁহাকে কারারুদ্ধ করতঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহাতে একটী বিপ্লব ঘটে। প্রজা-মণ্ডলী রামপাল দেবের পক্ষাবলম্বন হেতু মহীপাল সিংহাসনচ্যুত হন। এই সময় তাঁহাকে পিতৃভূমি কৈবর্ত্তরাজের হস্তগত হয়। রামপাল দীর্ঘকাল অধ্যবসায় ধৈর্য্যাবলম্বনের পর তাঁহার হস্ত হইতে উহার উদ্ধার সাধন করেন। এই রামপাল দেবের "মায়ন" নামে এক প্রসিদ্ধ সেনাপতি ছিলেন। তিনি কামরূপ রাজ্য জয় করিয়াছিলেন:—

ভস্যাজিত-কামরূপাদি বিষয় বিনিবৃত্ত
মানসম্পাদ্যঃ।
মহিমান মায়ন নৃপো যতমানস্য প্রজাভিরক্ষার্থম্॥
—রামচরিত, ৩।৪৭

কুমারপাল।

মহারাজ রামপাল ঔরসে সুপ্রসিদ্ধ কুমার-পাল দেবের জন্ম হয়। এই কুমারপালের "বৈদ্যদেব" নামে এক বিখ্যাত মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। এই বৈদ্যদেবের পিতামহের নাম ছিল "যোগদেব"। পিতার নাম "বোধিদেব" এবং মাতার নাম "প্রতাপ দেবী"। ১৮৯২ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে বৈদ্যদেবের ২৫ খানি তাম্রশাসন ৺বারাণসী ধামের গঙ্গা বরুণা —স্থলের নিকটবর্ত্তী "কমৌলী" গ্রামে জনৈক কৃষকের হলাকর্ষণকালে আবিষ্কৃত হয়। এজন্য ঐ প্রাপ্ত তাম্রশাসনগুলি কমৌলী লিপি নামে সুপরিচিত হইয়াছে। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে মহারাজা কুমারপালের রাজত্বকালের ঘটনা-বলীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম দক্ষিণ বঙ্গে নৌ-যুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ

কুমারপাল যখন বিহারে রাজত্ব করেন, তদীয় সেনাপতি বৈদ্যদেব তখন কামরূপ রাজ্যে শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতেন। কমৌলী-লিপি মধ্যে উল্লেখ আছে—শ্রীমান বৈদ্যদেব তৎকর্ত্তৃক বিজীত রাজ্যলাভের চতুর্থ বৎসরে বারেন্দ্র নিবাসী সোমনাথ নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে কামরূপ মণ্ডলে ভূমি দান করিয়া-ছিলেন।

কোহিনুর বা ভারতভাগ্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীগিরীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-ডি)

১৮১২ খৃঃ অঃ ফতে খাঁ পেশওয়ার হইতে আটক পার হইয়া সের মহম্মদের পুত্র আটা মহম্মদের হস্ত হইতে কাশ্মীর রাজ্য উদ্ধার করিতে যাত্রা করেন। মহারাজ রণজিত সিংহ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ফতে খাঁর সাহায্যার্থে মোকম চাঁদ নামক তাঁহার একজন প্রধান সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। অত্যল্প কাল মধ্যেই শত্রু বিতাড়িত হইল। কাশ্মীর মোকাম চাঁদ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। আটা মহম্মদ পলায়ন করিলেন। সাহ সুজা তৎকালে কাশ্মীরে আটা মহম্মদের বন্দী স্বরূপ অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ওফু বেগম। পতিপ্রাণা রমণী স্বামীর দুরবস্থায় সাতিশয় ক্ষুব্ধা হইয়া মোকাম চাঁদের সহিত এক অঙ্গীকার পাশে আবদ্ধ হইলেন। বলিলেন যে; সাহাসুজা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলে কোহিনুর শিখপতিকে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইবে। দেওয়ান মোকাম চাঁদ সাহ সুজাকে মুক্ত করিয়া—তাঁহাকে ও ওফু বেগমকে সঙ্গে লইয়া লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। লাহোরের রাজদরবার পক্ষ হইতে যুবরাজ কালওয়ার খড়ক সিং সপত্নীক সাহ্ সুজাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। সাদেবাতে তাঁহাদের বাসস্থান নিরূপিত হইল। শ্রান্তি-বিনোদনার্থ মুবারক হাভেলি নামক সুরম্য হর্ম্মে রাজদম্পতী বাস করিতে লাগিলেন। রাজকোষ হইতে সুচারুরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ নিমিত্ত অর্থ প্রদত্ত হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহারা অঙ্গীকার পালন করিতে পারিলেন না। রণজিৎ সিং কোহিনুর প্রার্থনা করিলে সাহ সুজা ও ওফু বেগম সেই হীরক অর্পণ করিতে ইতস্ততঃ

করিলেন। কোহিনুর তাঁহাদের নিকট নাই বেগম মহারাজকে এই উত্তর প্রদান করেন। মহারাজ বেগমের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন। সাহ সুজার একজন অনুচর মীর আবুল হাসন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া স্বীয় প্রভুর বহুমূল্যবান মণিমাণিক্য হস্তগত করেন এবং সেই দুর্বৃত্তই কোহিনুর যে শাহের নিকটে আছে এই গোপনীয় সংবাদ রণজিৎ সমীপে প্রেরণ করেন। ইহাতেও রণজিৎ তাঁহাদের প্রতি সদাচার প্রদর্শনে ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের পলায়নের পথ রোধ করিলেন। দাদেরা রাজ-প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে প্রহরী নিযুক্ত হইল। ওফু বেগম এইরূপে নজর বন্দী হইলেন। তাঁহার দুইজন বিশ্বস্ত অনুচর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া প্রহরীগণ কাহাকেও বেগম সমীপে যাতায়াত করিতে দিত না। সাহ সুজা বন্দী স্বরূপ অমৃতসরে গোবিন্দগড় দুর্গে প্রেরিত হইবেন এইরূপ ভীতি প্রদর্শন করা হইল। কোহিনুর কোন মহাজনের নিকটে বন্ধক আছে, এবং বহু অর্থে খোলসা করিতে হইবে বলিয়া ছলনা পূর্ব্বক সাহ দুইমাস সময় প্রার্থনা করিলেন। অনিচ্ছা পূর্ব্বক মহারাজও প্রথম অসম্মত হইয়া-ছিলেন। কিন্তু সুচতুর রণজিত সুজার ছলনা বুঝিতে পারিলেন। এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে এই সময় সুজা একবার পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাসগৃহের নিকট একটী বৃহৎ নর্দ্দামা ছিল। এই নর্দ্দামা ইরাবতী নদীতীর পর্য্যন্ত গিয়াছিল। রাত্রিকালে, অতি গোপনে, কোহিনুর লইয়া সুজা এই নর্দ্দামায় প্রবেশ করিলেন; কোনরূপে ইরাবতী তীরে উপস্থিত হইতে পারিলে অন্যত্র পলায়ন করিতে পারিবেন এইরূপ আশা মনে উদয় হইল কিন্তু তাঁহারসে চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। রজনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পলায়ন সংবাদ ব্যক্ত হইয়া পড়িল। তাহাকে ধরিবার জন্য চারিদিকে প্রহরী ছুটিল। কেহ কেহ সেই নর্দ্দামা মধ্যে তাঁহার অনুসরণ করিল। সুজা উহার বিষাক্ত বায়ু সেবনে মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া পড়েন। প্রহরীরা দেখিতে পাইল যে তিনি নর্দ্দামা মধ্যে একবার চলিতেছেন আবার বসিতেছেন। ধরা পড়িয়া তিনি কোহিনুর সহ ফিরিয়া আসিলেন। হায়! যে কোহিনুর মস্তকে ধারণ করিবার জন্য কত সম্রাট ব্যাকুল ছিলেন, এইরূপ দুর্গন্ধময় নর্দ্দামার মধ্যেও একদিন তাহার অবস্থান হইয়াছিল। মহারাজ বেগমকে স্পষ্টই জানাই-লেন যে, কোহিনুর ব্যতীত মহারাজ কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবেন না। উফু বেগম কতকগুলি বহু-

মূল্য হীরক মহারাজকে উপহার প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তন্মধ্যে কোহিনুর দেখিতে পাওয়া গেল না। মহারাজ অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। উক্ত বেগম ও তাহার আত্মীয়বর্গের ভরণপোষণের ব্যয় হ্রাস করিলেন। অবশেষে বাধ্য হইয়া সাহ সুজার পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে বেগম মহারাজকে কোহিনুর প্রদান করিবেন এই অঙ্গীকার করিলেন। সাহ সুজা অবিলম্বেই স্বাধীনতা লাভ করিলেন। কিন্তু মিথ্যা আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন। বলিলেন কোহিনুর কান্দাহারে এক বনিকের নিকট বন্ধক রহিয়াছে।* মহারাজ রণজিৎ সিংহ ক্রোধান্ধ হইয়া বেগমের খাদ্যদ্রব্যাদি প্রেরণ বন্ধ করিয়া দিলেন। দুই দল শিখ পদাতিক সৈন্য রক্ষকরূপে নিযুক্ত হইল। আজিজ উদ্দীন, ভাই গুরু বক্স সিং জমাদার খুসলাল সিংকে প্রেরণ করেন। সুজা মহারাজাকে স্বয়ং কোহিনুর লইয়া যাইবার জন্য অভিলাষ প্রকাশ করেন। যন্ত্রণার ভয়ে সাহ সুজার এইবার চেতনা হইল। উদ্ধার অসম্ভব বুঝিলেন। অঙ্গীকার মনে পড়িল। আপনাদিগকে শতধিক্কার দিতে লাগিলেন। অতঃপর সাহ সুজা মহারাজকে স্বয়ং কোহিনুর দিবেন বলিয়া পুনরঙ্গীকার করিলেন। এইরূপ বন্দী অবস্থাতেও পঞ্জাব কেশরী সাহ সুজাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। এইবার মহারাজ নিজেই সাহ সুজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মনস্থ করিলেন। ১৮১৩ খৃঃ অঃ ১লা জুন রণজিত বন্ধুবর্গ সমভিব্যহারে সাহ সুজার বাসস্থান দাদেরা প্রাসাদে গমন করিলেন। মহারাজ ও সাহ উভয়ে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। কিন্তু তৎপরে প্রায় ১ ঘণ্টা উভয়ে গম্ভীরভাবে উপবেশন করিয়া রহিলেন। কাহারও বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। অবশেষে মহারাজার ইঙ্গিতে তাহার একজন অনুচর সাহ সুজাকে মহারাজের আগমন উদ্দেশ্য স্মরণ করাইয়া দিলেন। সাহসুজা একজন ভৃতকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। দাস একটী পেটিকা আনয়ন করিল এবং মহারাজ ও সাহের মধ্যস্থলে কার্পেটের উপরি তাহা রাখিয়া দিল। মহারাজের অনুমতি ক্রমে, তাঁহার একজন কর্ম্মচারী দেওয়ান ভবানী দাস সেই পেটিকা খুলিয়া বহুমূল্য কোহিনুর হীরক প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমশঃ

* এই সময় দুই খানি পত্র লাহোর দরবারে প্রদর্শিত হইল। কেহ কেহ এই পত্র জাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। লেখক সুজা উল-মুলক কর্ত্তৃক উজীর ফতে খাঁ সমীপে প্রেরিত হইয়াছিল। এই পত্রে রণজিতের অত্যাচার ও সুজার দুরবস্থা বর্ণন পূর্ব্বক উজীর ও আফগানদিগের সাহায্য প্রার্থনা ছিল। পথিমধ্যে এই পত্রবাহক রাজকর্ম্মচারী দ্বারা ধৃত হয়।

কর্ম্মযোগ পুস্তক-ভাণ্ডার।

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক, ধর্ম্মমুলক উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত
ঋষিকল্প প্রবীণ লেখক, উপন্যাসাচার্য্য
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—

— নুতন উপন্যাস —

১। সতী-প্রতিভা।

পবিত্র হিন্দু-সংসারের নিখুঁৎ চিত্র—সতীর অপূর্ব্ব প্রতিভা। হরকোপানলে মদন-ভস্মের ন্যায়, সতী রোষানলে পাপীর ধ্বংস, বন্ধুরূপী লম্পটের ভীষণ পরিণাম, সংসারে সুখ ও শান্তির পুণ্যপ্রতিষ্ঠা—কেমন উজ্জ্বল, কেমন মধুর ভাষায় পরিস্ফুট হইয়াছে, যুবক যুবতীর শিক্ষনীয় উপহার গ্রন্থ। সমাজের বিবাহ প্রথার ও অন্যায় দেশাচারের সংস্কার সাধন ইহার উদ্দেশ্য। এমন মনোহর, এমন সরল ও সুখপাঠ্য উপন্যাস বাংলায় এই প্রথম। যুবক যুবতীর উচ্চ আদর্শ চরিত্র বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক; সংসারে পুণ্যের জ্যোতি প্রতিভাত হউক। সুন্দর রেসমী বাঁধাই। মূল্য মাত্র দেড় টাকা।

২। নদের নিমাই।

নদীয়ার শ্রীভগবান্ চৈতন্যদেবের অপূর্ব্ব জীবনী। ভগবানের অসংখ্য অবতার কিন্তু বাঙ্গালা দেশ কেবল শ্রীচৈতন্যদেবের জন্যই অহঙ্কার করিতে পারে। ভগবান্ শ্রীচৈতন্য দেব অবতার গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা-দেশ ধন্য করিয়াছেন, বাঙ্গালী-জাতি শ্রীচৈতন্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই একদিন এত প্রতিভাশালী হইয়াছিল; এবং সেই জন্যই তাঁহার পবিত্র জীবনী প্রত্যেক বাঙ্গালীর পাঠ করা উচিত। ইহা এত মনোরম এবং প্রীতিপ্রদ যে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়িতে পারা যাইবে না। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের এমন নিখুঁত জীবনী আর কখন প্রকাশিত হয় নাই; বাঙ্গালী, ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালী! তোমাদের নিকট ইহার নিশ্চয় আদর হইবে। ভগবান্ চৈতন্যের উন্মাদভাব, তাঁহার হৃদয়গ্রাহী হরিনাম সংকীর্ত্তন, তাঁহার প্রাণারাম, প্রেমভক্তিপূর্ণ উপদেশ পাঠ করিলে —হৃদয় ভক্তি-রসে আর্দ্র হইবে। প্রকাণ্ড গ্রন্থ সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—কর্ম্মযোগ প্রেস ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

কর্ম্মযোগ পুস্তক-ভাণ্ডার

শক্তি-সাধনা

ভারত আবার জাগিল !!!

উপন্যাসাচার্য্য পণ্ডিত প্রবীণ সাহিত্যিক

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের সিদ্ধহস্তের লেখা—

তন্ত্র-শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব

সরল সুললিত উপন্যাসের
মধ্য দিয়া কেমন সুন্দর
ফুটে উঠেছে।

শক্তির সাধনায়
এই মানুষ কেমন
ক'রে

উন্নতির শীর্ষস্থান

অধিকার করতে পারে
শক্তি-সাধনায় তাহা বিশদভাবে
বর্ণিত হ'য়েছে।

গৃহধর্ম্মে নারীশক্তির বিকাশ !

শক্তি-সাধনায়—হিন্দুর সোণার সংসার !

আত্মোন্নতি চাও—শক্তি-সাধনা প'ড়ে দেখ !

প্রকাণ্ড গ্রন্থ, স্বর্ণমণ্ডিত বাঁধাই, মূল্য ২॥০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—কর্ম্মযোগ প্রেস,
৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

হাওড়া—৪নং তেলকলঘাট রোড, "কর্ম্মযোগ প্রেস" হইতে শ্রীযুগলকৃষ্ণ সিংহ
দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অষ্টাবিংশ বর্ষ।] শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল। [চতুর্থ সংখ্যা।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রতিষ্ঠিত

আলোচনা

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ।

আলোচনার বার্ষিক মূল্য সডাক ২।৶০ আনা।

সূচীপত্র।

কি ক'রে বুঝাব

'বামাক্ষেপা' ও 'শক্তি-সাধনা'

কিরূপ উপাদেয়?

আলোচনা পত্রিকার নিয়মাবলী।

আলোচনার বার্ষিক মূল্য সহর মফস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ২৷৶০ আনা। সাধারণ সমিতি বা পাঠাগার হইতে ৵১০ অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ আবেদন করিলে নমূনা প্রদত্ত হইবে। বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ।

বিজ্ঞাপন দেওয়ার নিয়ম—মাসিক একপৃষ্ঠা বা দুই কলম—৮৲, অর্দ্ধপৃষ্ঠা বা এক কলম ৪॥০, সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম—২।০ সিকি কলম—২৲।

কভারের পৃষ্ঠার জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম। ছয় মাস বা তদূর্দ্ধ কালের জন্য বিজ্ঞাপনে স্বতন্ত্র চুক্তির দর দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। চুক্তির বিজ্ঞাপন তিন মাসের মধ্যে পরিবর্ত্তন করা হয় না।

আলোচনার জন্য বিনিময় পত্রিকা ও প্রবন্ধাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে। অন্যান্য চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই আমার নামে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ,

কর্ম্মযোগ প্রেস, ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

(ফোন নং ১৯১ হাওড়া)

মেঘ সমাগমে

[শ্রীপরেশ নাথ চৌধুরী]

কাজল কালো মেঘে বাদল আজি পুঞ্জীভূত,
কোন্ রূপসীর কুন্তলভার সিক্ত সে যে গ্রন্থিচ্যুত !
নাম্‌ল ধরার দীর্ণ বুকে বর্ষণেরি সম্ভাবনা,
আসন্নতার আভাস মেখে হঠাৎ বাতাস বইছে দ্রুত।

বর্ষা এল, বর্ষা এল, তৃপ্ত হ'ল ধরার তৃষা,
নয়ন-জোলে জল জমেছে তটিনী আর নয়ত কৃশা।
ভিজে মাটীর গন্ধে আনে কাজরী গাথার প্রস্তাবনা,
শ্যামল হ'ল সরস হ'ল মুগ্ধ হ'ল সকল দিশা।

আব্‌ছায়ারি কুহক ঢাকা লুপ্ত আজি ধূসর গিরি,
নীলের আভাস আড়াল হ'ল ধূমল ছায়া নাম্‌ল ঘিরি'।
বাতাস ছুটে বেড়ায় বেগে ঝাপ্টা রুধে দৃষ্টি সীমা,
রভসে ওই বইছে ধারা সান্দ্র মেঘের বক্ষ চিরি'।

কানন ভূমি আঁধার আজি মিলিয়ে গেছে মেঘের সনে,
প্রসব রাতের পুলক ব্যথা জাগ্‌ছে বুঝি বনের মনে!!
ঝরা পাতার শুষ্ক বুকে বৃষ্টিপাতের মর্ম্মরিমা
উঠ্‌ল বেজে—মুখর নিশি প্রথম ধারা-সম্ভাষণে।

মালবিকা *

(শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(১ম দৃশ্য—গণদাসের রঙ্গালয়)

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি ও যন্ত্র সঙ্গীত শ্রুত হইল।)

কৌশিকী—আহা! কি মধুর ধ্বনি!

রাজা—(অর্দ্ধ স্বগতভাবে)—এইবার আমার বহুদিনের অভিলাষ সফল হ'বে। অন্তর আজ উৎসব কর' উৎসব কর'!

ধারিণী—আর্য্যপুত্র কি বলছেন?

বিদূষক—উনি বল্‌ছেন, আজ্‌কের দৃশ্য নিশ্চয়ই খুব মনোরম হবে। (রাজার প্রতি জনান্তিকে) বেফাঁস কোন কথা বল্‌বেন না মহারাজ! নইলে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা প্রাণেই বিলীন হয়ে যাবে।—সব মাটি হয়ে যাবে। দেবী আমাদের মতলব বুঝ্‌তে পার্‌লে, মহা মুস্কিলে পড়্‌তে হবে।

রাজা—(জনান্তিকে) আর ধৈর্য্য ধর্‌তে পার্‌ছি না, সখা। এই মধুর বাদ্য যেন আমার অভিলাষ সিদ্ধির সূচনা কর্‌ছে।—(উচ্ছ্বসিত ভাবে) আজ বিজয় উৎসব কর' বিজয় উৎসব কর'; আমার সকল ইন্দ্রিয় আজ বিদ্রোহ করেছে। উৎসব, উৎসব, উৎসব!

(উদ্ভ্রান্তভাবে প্রস্থান)।

(সকলে তাঁহার দিকে বিস্মিত ভাবে চাহিলেন। বাদ্য নীরব হইলে সকলে প্রস্থান করিলেন!)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(গণদাসের রঙ্গালয় মধ্যবর্ত্তী প্রেক্ষাগৃহ)

রাজা, বিদূষক, পারিষদ্‌বর্গ, ধারিণী, ও কৌশিকী আসীন।

(নেপথ্যে গীতধ্বনি শ্রুত হইতেছে; ক্রমশঃ গীত স্পষ্ট হইতে লাগিল)

সাড়া দাও, ওগো, সাড়া দাও;

পরাণ গাঙে কূলে কূলে,

কান্না হাসি উছলে তুলে,

কোন্ উজানে ভাসিয়ে দাও?

(গীত ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইতে লাগিল।)

মনের মাঝে কি সে বেদন,

ব্যর্থ করে হিয়ার সাধন,

* এই নাটকের গানগুলি আমার পরমবন্ধু শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্যের রচনা।

বিষের ব্যথা বুলিয়ে দাও।

আজি রে প্রাণের মেলা,
খেলিছে মায়ার খেলা,

শান্তি হ'য়ে ক্লান্তি দাও।

বেসুরা বাজিয়ে সারঙ্,
ধরিয়া অরূপ বরণ,

নিখিল ভরা রঙ্গে গাও!

অশ্রু আঁধা আঁখি-পাতে,
দীপ্ত সে কোন্ চাঁদ্‌নী রাতে,

করুণ-মরীচি এনে দাও!

রাজা—আহা! কি অপূর্ব্ব রাগপরিবাহিনী গীতি!

বিদূষক—মহারাজ! (কানে কানে কিছু বলিলেন)

রাজা—এঁ্যা—সত্য, সত্য, সত্য—(বিদূষক বাধা দিলেন)

রাজা—(সংযত ভাবে)—ভগবতি! এই দুই নাট্যাচার্য্যের মধ্যে কার অভিনয় আগে দেখতে ইচ্ছা করেন?

কৌ—অভিনয় নৈপুণ্যে উভয়ে প্রায় সমান হ'লেও বয়সের খাতিরে গণদাসের কিছু বেশী সম্মান পাওয়া উচিত।

রাজা—মৌদ্গল্য, ভগবতীর ইচ্ছা আচার্য্যদের কাছে জানিয়ে, তাঁদের শীঘ্র অভিনয় আরম্ভ ক'র্‌তে বল।

কঞ্চুকী—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

রাজা। (স্বগতঃ) হৃদয় উদ্বেল হ'য়ো না।

(গণদাসের প্রবেশ)

গণ—মহারাজ! শর্ম্মিষ্ঠার লয়মধ্যা চতুষ্পদী ছলিক নাটকের অভিনয় মন দিয়ে শুন্‌তে আজ্ঞা হোক্।

রাজা—আচার্য্য! আমার এ বিষয়ে খুবই আগ্রহ আছে। আপনি যত শীঘ্র পারেন অভিনয় আরম্ভ করে দিন।

বিদূ—ওদিকে ত বেলাও বড় কম হয় নি—

(গণদাসের প্রস্থান)

রাজা—(জনান্তিকে) সখে গৌতম! আর ত ধৈর্য্য রাখা যায় না। নেপথ্য থেকে মালবিকার গান শুনে অবধি তাকে দেখ্‌বার জন্যে আমার প্রাণ মন অধীর চঞ্চল হয়ে উঠেছে—নয়ন উৎসুক হয়ে উঠেছে এখনই যবনিকা ছিঁড়ে ফেলে তাকে দেখে আসি।

বিদূ—আস্তে মহারাজ, আস্তে। এ সব কথা অত জোরে বল্‌বেন না। এতদূর উতলা হচ্ছেন কেন? আপনার পক্ষে সেটাতো শোভন নয়।—যদি দেবী একবার ঘুণাক্ষরে আমাদের মতলব বুঝতে পারেন ত সব ফেঁসে যাবে। (সহসা সহর্ষে) ঐ দেখুন মহারাজ! নয়ন-মধু

এসে উপস্থিত হয়েছে। দেখবেন, যেন দেখতে দেখতে মত্ত হয়ে না ওঠেন।

(গণদাস ও অসামান্য রূপ যৌবন সম্পন্ন লাবণ্যপ্রতিমা মালবিকার প্রবেশ।)

বিদূষক—[জনান্তিকে] দেখুন, মহারাজ, প্রাণ ভরে নয়ন ভরে দেখুন। মহারাজ! অন্যের অধীনে থেকেও তাঁর সৌন্দর্য্য একটু মলিন হয় নি—এর রূপমাধুরী যেমন তেমনি আছে, বরং জোয়ারের ভরা নদীর মত সর্ব্বাঙ্গ বহে রূপ-যৌবন যেন উছলে পড়ছে।

রাজা—[জনান্তিকে] আঃ! থামনা, কি জ্বালাতন আরম্ভ করলে। (কিছু পরে) বয়স্য, দেখ দেখ! এর ছবি দেখে প্রথমে মনে করেছিলাম, বুঝি বা মানুষ এত সুন্দর হ'তে পারে না! ভয় হয়েছিল, বুঝিবা ছবিতে বাড়িয়ে এঁকেছে—কিন্তু এখন স্বচক্ষে দেখে, সে ভয়টুকু ত ভেঙ্গে গেছেই বরং এই মনে করে আনন্দ হচ্ছে যে, যে সৌন্দর্য্য-জ্ঞানহীন বর্ব্বর সে ছবি এঁকেছিল, সে এ অনুপম রূপের শতাংশের একাংশও তার ছবিতে ফোটাতে পারে নি।

গণ—(মালবিকার প্রতি) বৎসে! কোন ভয় নেই। বেশ নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে ধীরে ধীরে নিজের কাজ আরম্ভ কর। আর এঁরা সবই তোমার পরিচিত—এঁদের কাছে তোমার লজ্জাই বা কি?

ক্রমশঃ

জাতি-গঠনের চতুরঙ্গ

জাতিগঠনের প্রধান উপকরণ—শিক্ষা। আমাদের তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত শিক্ষার কথা এখানে বলিতেছি না—প্রকৃত শিক্ষা হয় গুরুমুখী, তাহাতে গড়িয়া তুলে—মনুষ্যত্ব ও চরিত্র। খাঁটি, কল্যাণনিষ্ঠ, দেশমুক্তি ও ভাগবত-ব্রতে উৎসর্গধর্ম্মী চরিত্রগঠনের জন্যই জাতীয় শিক্ষার মহদনুষ্ঠান আরম্ভ করা চাই। এ আয়োজন সফল হইবে, যদি আমরা পাশ্চাত্য অনুকরণ মোহে বিভ্রান্তমতি না হইয়া খাঁটি দেশানুপ্রেরণার বশবর্ত্তীতায় নূতন জাতিগঠনকারী শিক্ষাদীক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে পারি। এই নূতন গঠনকারী শিক্ষা-উহা হইবে প্রকৃত ভারতীয় শিক্ষা, যে শিক্ষা ছিল অন্তর্ম্মুখী, মূলতঃ ধর্ম্মপ্রেরণাশ্রিত, সাধন-রাজ্যে প্রবেশের অধিকার স্থায়ী পাথেয় স্বরূপ। বাংলায় এই জাতি নির্ম্মাণের অনুকল্প স্বরূপ নব শিক্ষাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবারই দিন আসিয়াছে। এ প্রেরণা আর ব্যর্থ হইবে না।

পাশ্চাত্য যে শিক্ষা ও সভ্যতার প্রচলন এ দেশে করিয়াছে, তাহা ঋতুপুষ্পের মত বাহারে চাক্‌চিক্যময়, পরন্তু তাহাতে সার অল্প—সেশিক্ষা অন্তরকে শোধন জ্ঞান-প্রেম-পুণ্যাভিষিক্ত, উদার ও মহান্ প্রভাবের আশ্রয়স্থল করিয়া তুলে না। উহাতে মনুষ্যত্বের কর্ষণ হয় না; হৃদয়, প্রাণ ও প্রতিভা চির বুভুক্ষু থাকিয়া, উপযুক্ত অনুশীলন-ক্ষেত্রও অবসর অভাবে, শুষ্ক মরুভূমি প্রায় রহিয়া যায়—গোটা মানুষটা তাহার সবখানি গুণ, প্রাণ ও ঐশ্বর্য্য লইয়া ফুটিতে পারে না। তার উপর যে জাতিসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য ও যোগ সাধন, জাতীয় শিক্ষার যাহা মূলনীতি, অন্তরঙ্গ বিধান, যাহা নহিলে জাতির কেন্দ্র প্রেরণাটিই বিফল হইয়া যায়, জাতীয় জীবনের ফল্গু ধারা রক্ষা পায় না—সে·যোগ ও সংরক্ষণনীতি ত উহার ধারণা ও জ্ঞানের বহির্ভূত, ইচ্ছার মূলেও তাহা একেবারে নাই। তাই এ পাশ্চাত্য-লব্ধ অসিদ্ধ বহিঃ-শিক্ষার ধারা ভঙ্গ করিতেই হইবে, জাতি-সাধনার পুণ্য বোদকায় উহাকে কোন ছদ্মবেশে আর প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না।

কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক প্রেরণা ও প্রতিষ্ঠানের আশ্রয়ে এ যাবৎ যে জাতীয় শিক্ষানুষ্ঠান, তাহার মূলে দেশানুধ্যান থাকিলেও কর্ম্মবিধানে বৈদেশিক শিক্ষানবীশীর প্রকারান্তর ছাড়া আর সিদ্ধ হইয়া উঠে নাই। ইহার কারণ আমরা দেশপ্রেরণার আবেশটুকুরই অন্তরে ছোঁয়া পাইয়াছি, ইচ্ছার অনুরূপ ভাবস্ফুটনও হয় নাই, জীবন গঠন ত আরও দূরের কথা। এমন অসিদ্ধ ভাব ও জীবন লইয়া, জাতীয়তার উদ্বোধনযজ্ঞ যে ব্যর্থ চেষ্টা হইবে, সে ত আশ্চর্য্য নয়। জাতীয়তার, দেশমাতার নামজপ করিয়াছি, যেটুকু পুণ্য প্রভাব সে ঐ মাতৃনামের মহিমা, কিন্তু সত্য জাতীয় শিক্ষার স্বরূপ সৃষ্টি করিতে আমরা এখন কোথাও পারি নাই। অথচ জাতিগঠনের জন্য জাতীয়তামূলক শিক্ষাভিত্তিরই প্রয়োজন, যাহাকে আমরা ইতিপূর্ব্বে "শিক্ষাস্বরাজ্য" বলিয়া অভিহিত করিয়াছি—এই "শিক্ষা-স্বরাজ্যের" প্রবর্ত্তকগণকে সম্যক্ বিধানে জাতি সাধনার মর্ম্মজ্ঞ হইতে হইবে ও চরিত্রে, চিন্তায়, আচরণে, সর্ব্বতোভাবে উহারই সিদ্ধমূর্ত্তি আকারিত করিয়া তুলিতে হইবে।

জাতীয়তামূলক চিন্তা ও সাধনার শক্তি-কেন্দ্র—একটা তপঃ-সমষ্টি। ইহার যে স্বরূপ উহাকে সঙ্ঘ বলে। এরূপ ভাবকেন্দ্র চারিদিকে গড়িয়া উঠুক ইহা আমরা দেখিতে চাই। শক্তির

মূল কেন্দ্র স্বতঃই চিহ্নিত হইবে। জাতি-সাধনার উৎস-কেন্দ্র লইয়া মারামারি করিবার আবশ্যক নাই, জাতির সত্তা যেখানে ফুটিবে, সেইখানেই উহা নিরূপিত হইবে। জাতির চাওয়াই যে বিদ্যুচ্ছক্তির মহাধার, সেই শক্তি যেথায় নামিবে, যাহারা ধরিবে, তাহাদের অখণ্ড তপস্যাই তাহার নির্দ্দেশ দিবে।

এরূপ দেশেচ্ছাটি পাইয়া আত্মসমর্পণে তাহাকে আধারস্থ করিতে পারিলে, জাতি সাধনার সূত্রপাত হয়। যে সঙ্ঘ এমন দেশেচ্ছার তপঃবিগ্রহ হয়. দেশ ধীরে ধীরে তাহাকে কেন্দ্রশক্তিরূপে চিনিয়া বাছিয়া লয়—এ পরিচয় ও নির্ব্বাচন দীর্ঘ আত্মদানের তপস্যা প্রভাবেই সম্ভব হয়—তখন অবধারিত উহা দেশমূর্ত্তির বরণডালা মাথায় লইয়া বাহির হয়—মুক্তি যাত্রায়। ইহারাই যেদিন দেশ-গঠনের তপস্যা বহুমুখী স্রোতে দেশময় বহাইয়া দেয় সে মুক্ত বিধানে নবশিক্ষা ও নব নির্ম্মাণের বিরাট ভঙ্গী আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। আবশ্যক বাগাড়ম্বর নয়, উত্তেজনা নয়, তপস্যাই শক্তিলাভের মূল, এই তপস্যার অনিবার্য্য প্রকাশেই—জাতিগঠনের সত্য ও সিদ্ধ শিক্ষা-বনিয়াদের প্রতিষ্ঠা হইবে।

তারপর, এই জাতি গঠনের আর উপকরণ কি? জাতির মঙ্গলমূর্ত্তি, সে শুধু একটা অধ্যাত্ম institution নয়—জাতির প্রস্ফুট রূপ—নর-নারীর মিলন সমষ্টি যে সমাজ; ঐ সমাজের নব-মূর্ত্তি, শিক্ষানুষ্ঠানের বীজকোষ চিরিয়াই ফুটিয়া উঠিবে।

এমন শিক্ষা-বিধানের প্রবর্ত্তন চাই যাহাতে 'নেশন' সম্বন্ধ-বৈচিত্র্যের সমাহার লইয়াই সমগ্রাবয়বে আপনাকে আবিষ্কৃত করিতে পারে, আবির্ভূত হয় একটা মহা-জাতি-রূপ, যাহা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুরঙ্গের সমলঙ্কৃত, সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী, ভাগবত পূর্ণতারই সমষ্টিবিগ্রহ। এই পূর্ণতার তপস্যার যে ভঙ্গী, উহাতে institution গড়িয়া আবার, institution কে ছাপাইয়াও মুক্ত সমাজ বিধানে পরিণত হওয়া বাধিবে না—এমন ভাবেই উদার দৃষ্টিতে, প্রেরণায় ঝরণা-মুখটাকে সহস্রধোরা সৃজন-সাধনার সময়ে ঘুরাইয়া ধরিতে হইবে।

চাই যেমন শিক্ষা, তার পূর্ণবিকাশ সমাজ গঠনে, তেমনি শিক্ষা ও সমাজকে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিষ্ঠ হইয়াই স্বাধীন অর্থ প্রতিষ্ঠানের পাকা ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষার গুণেই মানুষ হইবে স্বাবলম্বী স্বপ্রতিষ্ঠ, সমাজে মানুষ হইবে স্বাধীন স্বধর্ম্মপরায়ণ প্রত্যেকে বিশিষ্ট আশ্রমধর্ম্মি অথচ অভেদস্বরূপ ও অখণ্ড দেবপরিবারভুক্ত এই ধর্ম্মভেদে বিচিত্র প্রয়োজনাধিকার নিরূপিত

হইলেও সমাজের মূলে থাকিবে যেমন ঐক্য ভাবের সাধনা, তেমনি তাহার মর্ত্ত্য-রূপ যে অর্থ প্রতিষ্ঠান, তাহার মর্ম্ম হইবে একই; শ্রমের সার্ব্বভৌমিকতায় তাহা অখণ্ড, অর্থের সত্বাধিকার সম্বন্ধেও তাহা অস্বতন্ত্র সর্ব্বতোভাবে জাতীয়তত্ত্বেরই রূপ ও স্বরূপ গঠনের জন্য আমাদের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সাধনা। যে জাতি আমরা এই ঐক্যমূলক শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজ ও অর্থনীতির বিকাশে গড়িয়া তুলিতে চাই, তাহা মুক্ত প্রবাহে অনাহত সাধনে যাহাতে মোক্ষপথে অগ্রসর হয়, সেইদিকেই সর্ব্বশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

এই মোক্ষ লয়-মুক্তি নয় জাতির জীবমুক্তি—দেশের স্বাধীনতা। সেই জাগ্রত মোক্ষ-বিধানই আমরা আবিষ্কার করিতে চাই, প্রত্যক্ষ সাধনায় মূর্ত্ত করিয়া তুলিব সেই রাষ্ট্র যাহা ভারতজাতিকে তাহার সনাতন-দেবধর্ম্মের অপ্রতিদ্বন্দী স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিতেই সদা উদ্‌যুক্ত রহিবে, সেখানে কোনও পরধর্ম্মের বিঘ্ন বাধা টিকিবে না, থাকিবে না, পরইচ্ছার ভারবোঝাই, জাতির উপর অজাতির আরোপ, বিজাতির অত্যাচার—সেই স্বাধীন মহারাষ্ট্রই অখণ্ড ভারতের জাতি-চক্র-রূপে পরিণত আত্ম-সাধনায় গড়িয়া তুলিব। এই মোক্ষের সাধনায়, স্বাধীনতার উপাসনায় অন্তর্ম্মুখী জাতিশক্তিকে যেদিন সিদ্ধ অভিযানে বাহির করিতে পারিব, সেইদিনই আমাদের তপস্যার সাফল্যের দিন, সিদ্ধির বহিঃপ্রকাশ বিজয়-পতাকা উড়াইয়া মহাভিসারে মুক্তি-তীর্থে অভিগামী হইবে—নবতান্ত্রিক পূর্ণযোগীর দল, এ যে অব্যর্থ স্বপ্ন, নিশ্চিত ভবিষ্যতের উজ্জ্বল কল্পচিত্র—ঐ দেখ দূরে উষালোকে স্বর্ণরাগে ঝলসিয়া উঠিতেছে তোমরা লক্ষ সন্তান উদ্‌বুদ্ধ কণ্ঠে গাহিয়া বল—

> "এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন
> আসিবে—সেদিন আসিবে।"

প্রবর্ত্তক।

বিচার

(শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লক্ষী যদিও বিষ্টুকে সুরেনের পশ্চাতে পাঠাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু সুরেন তাহাকে ফিরাইয়া দিল। সুরেন বলিল, "তুমি বাড়ী যাও বিষ্টু আমার সঙ্গে তোমায় আসতে হবে না।"

বিষ্টু বলিল "ছোট দিদিমণি যে আমায় আপনার সঙ্গে যেতে বলে দিয়েছেন বাবু।"

"তোমার দিদিমণিকে ব'লো যে আমি একাই যেতে পারি। আমি ছেলে মানুষ নই। তুমি ফিরে যাও।"

"দিদিমণির বারণ আছে বাবু। আমি ফিরে গেলে তিনি বড় রাগ কর্ব্বেন।"

"আমার নাম করে ব'লো। তাহলে আর রাগ কর্ব্বে না।"

"আপনি ফিরিয়ে দিলেও আপনার সঙ্গে যেতে বলেচেন। আর এইতো এসে পড়েচি বাবু; আর কতটুকুই বা।" কিন্তু সুরেন কিছুতেই শুনিল না অগত্যা বিষ্টু ফিরিয়া আসিল।

সমস্ত পথটাই সুরেন অপমানের কথা ভাবিতে ভাবিতে আসিল। জননীর উপদেশ বাণী শুনিয়া তাহার লুপ্ত উৎসাহ যাও বা একটু পুনর্জীবন লাভ করিয়াছিল, প্রকাশের নিকট হইতে অপমানিত হইয়া তাহা পুনরায় নিরুৎসাহে পরিণত হইল। কিন্তু যতই কেন তাহার আঘাত লাগুক না শুধু এটুকু তাহার সান্ত্বনা ছিল যে লক্ষ্মী সে অপমানে যোগ দান করে নাই। বরং সে তাহার পক্ষ লইয়াই উহাদের অনেক কথা শুনাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু গাড়ীতে যাইতে যাইতে লক্ষ্মীর সহিত তাহার যে সব মান অপমানের কথা হইয়াছিল, তাহাতে সুরেন একটু ব্যথিত হইয়াছিল। লক্ষ্মী হাজার তর্ক করিলেও, সে কিছুতেই বুঝিতেই পারিল না কেন সে অক্ষয় বাবু এবং লক্ষ্মীর নিকট হইতে জিনিষের দাম গ্রহণ করিবে। তাহারা তো সাধারণ লোকের মত সামান্য ক্রেতা নহে। তাহারা তো ঘরের লোক। তাহাদের নিকট হইতে মূল্য গ্রহণ করাও যা আর নিজের পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগ্নীর নিকট হইতে মূল্য গ্রহণ করা তো একই কথা।

এতই যদি লক্ষ্মীর মান অপমানের ভয় থাকে তবে সে তাহার নিকট হইতে গাড়ী ভাড়া চাহিয়া লইতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করিল না কেন! ইহাতে সুরেন অত্যন্ত সন্তুষ্টই হইয়াছিল এবং লক্ষ্মী যে তাহাকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে যে গাড়ী করিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় এখন তাহার নহে ইহাতেও সে তাহার উপর সন্তুষ্টই হইয়াছিল এবং এইটুকু বুদ্ধি যে তাহার নিজের মাথায় আসে নাই ইহার জন্য সে লজ্জিতও হইয়াছিল। কিন্তু মান অপমানের কথা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। রাত্রে আহারে বসিয়া জননীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, জ্যেঠামশায় যে এখান থেকে

জিনিষ নিয়ে যান তার দাম দেন কেন?" জননী উত্তর করিলেন, "তাঁর যখন পয়সা দেবার ক্ষমতা আছে বাবা, তখন তিনি অমনিতেই জিনিষ নেবেন কেন?" "তা বলে আপনার লোকের কাছ থেকেও দাম নিতে হবে?" ব্যবসাতে আপনার পর বলে কিছুই নেই বাবা, সম্বন্ধ শুধু ক্রেতা আর বিক্রেতা। আহ্লাদ করে তুমি যদি কোন জিনিষ তাঁকে দাও, তার দাম তিনি দেবেন 'না এবং তোমারও নেওয়া উচিৎ নয়। কিন্তু কোন জিনিষ কিনিতে এলে তার দাম দিতেও হবে নিতেও হবে। এতে তো চক্ষু লজ্জার কোন কারণ নেই।"

"আমার কিন্তু মা বড্ড লজ্জা করে।"

"এটুকু ছাড়তে হবে বাবা। ন্যায্য পাওনা গণ্ডায় আবার লজ্জা কিসের? তা ছাড়া আর একটা কথা হচ্চে বাধ্যবাধকতা। তোমারি কাছে বাধিত হতে যদি কেউ না চায়, তুমি তাকে বাধিত করবে কোন অধিকারে! তুমিও কারুর কাছে বাধিত থাকবে না, তোমার কাছেও কেউ বাধিত হবে না।

"কিন্তু মা, যেখানে হৃদয়ের সঙ্গে সম্পর্ক, যেমন স্নেহ কৃতজ্ঞতা সেখানেও সে ঋণ পরিশোধ করবার চেষ্টা কত্তে হবে। এ জীবনটাই শুধু দেনা পাওনার হিসাব নিকাশ করা। কি কর্ম্মক্ষেত্রে—কি হৃদয় ক্ষেত্রে, তোমার যদি কারুর কাছে পাওনা থাকে তুমি তা সম্পূর্ণ আদায় করে নেবার চেষ্টা কর্ব্বে, আর তোমার যদি কারুর কাছে কিছু দেনা থাকে তুমি তাকে কড়া ক্রান্তি পর্য্যন্ত চুকিয়ে দেবে। যে মানুষ তা পারে তারই জীবন সার্থকের, সেই মুক্ত হৃদয়ে পরপারে যেতে পারে।"

ততক্ষণে সুরেনের খাওয়া হইয়া গিয়াছিল। সে রাত্রে জননীর সহিত আর কোন তর্ক বিতর্ক না করিয়া আপনার শয্যায় যাইয়া শুইয়া পড়িল। নিদ্রা কিন্তু আসিল না। জননীর সমস্ত কথা এবং গাড়ীতে লক্ষ্মীর সহিত যে সমস্ত কথা হইয়াছিল, তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। তবে তো লক্ষ্মী যাহা বলিয়াছে তাহাই ঠিক। কেনই বা তাহারা অযথা তাহার নিকট বাধিত থাকিবে? এবং সেই বা কেন তাহাদের অনিচ্ছা সত্বেও তাহাদের বাধিত করিবে। লক্ষ্মী গাড়ী ভাড়া চাওয়ার মধ্যেও সুরেন কোন বাধ্য বাধকতার ভাব দেখিতে পাইল না। বরং লক্ষ্মীর এ ব্যবহারে সে আরও প্রীত এবং লক্ষ্মীর প্রতি আরও আকৃষ্ট হইয়াছিল। লক্ষ্মী যে তাহাকে কতখানি আপনার ভাবে ইহাতেই তাহা স্পষ্ট প্রমাণ হয়।

এক দিক্‌কার চিন্তা ও উদ্বিগ্ন হইতে নিষ্কৃতি

লাভ করিলেও প্রকাশের অপমান সুরেন কিছুতেই ভুলিতে পারিল না। সে অনেক করিয়া মনকে বুঝাইল, মনে মনে অনেক তর্ক বিতর্ক করিল, কিন্তু সে আঘাৎ হৃদয় হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে পারিল না। তবে পাছে জননী শুনিলে মনঃকষ্ট পান কিংবা তাহার হৃদয়ের এ দুর্ব্বলতার জন্য তাহাকে ভর্ৎসনা করেন এই ভয়ে সে জননীকে কিছুই বলিতে পারিল না।

কিন্তু সকালে উঠিয়াই প্রথমে যখন জননী বলিলেন, "আজ তোকে একবার প্রকাশের বাড়ী যেতে হবে বাবা" সুরেন বিস্মিত এবং অবাক্ হইয়া গেল, বলিল "কেন।"

"কতকগুলো রুমাল আর গেঞ্জি তৈরী করেছি, একবার তাদের দেখিয়ে আন্ যদি কেনে।"

"তারা তোমার খদ্দরের রুমাল আর দেশী গেঞ্জী কিনিতে যাবে কেন? আর, আমি ও পারব না। প্রকাশের কাছে আমি যেতে পারব না।"

সুরেন বিস্মিত হইয়া গেল; শুধু এইটুকু ভাবিল যে তাহার জননী কি সমস্ত ব্যাপার জানেন! আর কাহারও বাড়ী না যাইতে বলিয়া, প্রকাশের বাড়ীই বা যাইতে বলিতেছেন কেন?

কিন্তু স্বরস্বতী দেবী এ সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। তিনি সন্তানের উত্তর শুনিয়া একটু সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রকাশের বাড়ী যাবিনি কেন? খদ্দরের রুমাল আর দেশী গেঞ্জি নিক্ আর না নিক্ একবার দেখিয়ে আসিতেই বা দোষ কি?" সুরেন দৃঢ়ভাবে বলিল "না মা তোমার পায়ে পড়ি ওখানে আমায় পাঠিও না।"

স্বরস্বতী দেবী অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন, প্রকাশের সঙ্গে তোমার কি হয়েছে?"

"না তেমন কিছু হয় নি, তবে কাজ কি ওখানে গিয়ে, অন্য যায়গায় বিক্রী কল্লেও তো চলবে।"

স্বরস্বতী দেবী আরও দৃঢ়ভাবে বলিলেন "না তোমায় ওখানেই যেতে হবে। তার সঙ্গে কি হয়েছে শুনি?"

জননীর পীড়াপীড়িতে অগত্যা সুরেনকে সমস্ত কথাই বলিতে হইল। শেষে বলিল,—'এর পরেও কি তুমি আমায় ওখানে যেতে বল।' উত্তেজিত সন্তানের মুখের দিকে চাহিয়া স্বরস্বতী দেবী হাসিয়া বলিলেন, "এই কথা! এরই জন্য ওর কাছে তুমি যাবে না?"

জননীর ভাব দেখিয়া সুরেন আরও বিস্মিত

হইয়া গেল। এত বড় একটা অপমানের কথা তিনি সে এমনিভাবে হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন সুরেন তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই।

তিনি বলিলেন, "ফেরিওয়ালাকে ফেরিওয়ালা বলেচে এ তো পরম আনন্দের কথা বাবা। এতে দুঃখ করবার কিছু নেই। আর আমি সেই ফেরিওয়ালার মা, এওতো আমার সৌভাগ্যের কথা।"

"তুমি একথা হেসে উড়িয়ে দিতে পার মা, আমার মনে কিন্তু বড্ড লেগেচে। আমি এ কথা হেসে উড়িয়ে দিতে পারি না।" পুত্রের স্কন্ধে হাত দিয়া তিনি বলিলেন, "তোমাকেও এ কথা হেসে উড়িয়ে দিতে হবে বাবা; তা না হলে তুমি তো বর্ত্তমান সংগ্রামে জয়ী হতে পারবে না। কখন কারুর কাছে এতটুকু অপমান সহ্য করনি, কখন কারুর কাছে কোন অপ্রিয় কথা শোন নি, শুধু সুখই করে এসেছ, তাই প্রতিপদে পদে তোমার এত আঘাত লাগচে। কিন্তু বাবা অতীতটাকে তোমার সম্পূর্ণ ভুলে যেতে হবে, বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ লিপ্ত থাকতে হবে, লক্ষ্য রাখবে শুধু ভবিষ্যতের সফলতার দিকে। শুধু তোমার মহান্ উদ্দেশ্যটাকে সামনে রাখবে। কে কি বল্লে না বল্লে তা গ্রাহ্য করবার দরকার নাই। অন্য কোন কারণ থাকলে প্রকাশের কাছে না পাঠাইতে পারতুম। কিন্তু এই যখন কারণ তখন তোমায় যেতেই হবে।

জননীর আদেশ সুরেন কোন দিনই লঙ্ঘন করে নাই। আজও পারিল না। জননীর স্বরের দৃঢ়তা এবং আদেশের গাম্ভীর্য্য বুঝিয়া সুরেন আর তাঁহার উপর কোন কথাই বলিতে সাহস করিল না।

সুতরাং সে গেঞ্জি ও রুমাল কয়খানি লইয়া প্রকাশের বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

পুত্রকে হাসিমুখে আদেশ ও উৎসাহ দিলেন বটে, কিন্তু এ কথা শুনিয়া তাহার মনে একটু আঘাৎ লাগিয়াছিল। কিন্তু পুত্র অপেক্ষা চিত্তের উপর অধিকার তাঁহার অধিক ছিল।

সুরেন যতক্ষণ না বড় রাস্তার মোড়ে যাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল, তিনি এক দৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে ভগবানের উদ্দেশ্যে করযোড়ে বলিলেন "হে ভগবান আমার সুরেনকে সুখী করো। তাহার হৃদয়ে বল দাও। আমাকেও শক্তি দাও প্রভু যাতে ক'রে তাকে আমি সোজা পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি।"
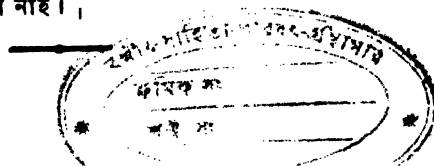
ক্রমশঃ

কলিকাতায় অদ্ভুত জুয়াচুরী

"লেবারার্স ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড"

রহস্যপূর্ণ কাহিনী!

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীঅমূল্যচরণ মিত্র)

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ১৯২২ সালের পূজার ছুটী ফুরিয়ে গেল, কিন্তু হায়! বেচারী পাওনাদারদের কড়ার মত টাকা পাওয়া গেল না। পূজার ছুটীর মধ্যেই ব্যাঙ্কের সুযোগ্য ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বেমালুম সরে পড়েছেন! যে সকল লোককে Co-operative Hindusthan Bankএর উপর চেক কেটে দিয়েছিল, তারা নির্দ্দিষ্ট তারিখে সেখানের কাউণ্টারে চেকগুলি দাখিল করতে না করতেই dishonoured হতে লাগলো। কেউ কেউ পুলিশে ডায়েরি ক'রে রাখলে—আবার কেউ পুলিশ কোর্টে নালিশ রুজু করলে। চেকের জন্য যে ফৌজদারি মকদ্দমা হয়েছিল, তা কলিকাতার সকল খবরের কাগজেই ছাপা হয়েছিল। ১৯২২ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখের "সার্ভেণ্ট" পত্রিকাতে এ সম্বন্ধে যা রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল, তার অবিকল নকল দিয়ে দিলাম—

"Summons issued—At the Southern Division Police Court before Mr. A. Z, Khan, the third Presidency Magistrate, Mr. M. A. Huq on behalf Syed Sujat Ali who is said to be an Agent of the Labourers' Union Bank of Murshidabad. obtained a summons against Babu Dinanath Mazumdar, said to be the Mg. Director of the Bank, on a charge as alleged of cheating in respect of Rs. 100 by issuing a cheque for the amount on the Co-operative Hindusthan Bank, which, on being presented for encashment was dishonoured. The Magistrate ordered the issue of a process against the defendant on a charge of cheating."

একজন মামলা সুরু করতেই পাওনাদারেরা

হুড় হুড় করে কলিকাতায় ছোট আদালত আর পুলিশ কোর্টে আস্‌তে সুরু ক'রল। পূজার ছুটী ত কবে ফুরিয়ে গেছে, পাওনাদারদের কড়ারের তারিখও শেষ হ'য়ে গেছে। মিঃ মজুমদারের সঙ্গে শেষ দেখা ক'রে যা হোক একটা হেস্ত নেস্ত করা যাবে, অনেকেই স্থির করেছিল—কিন্তু কোথায় তার দেখা পাবে? সে একটু সুযোগ পেয়েই একেবারে রাবণ রাজার দেশ লঙ্কাদ্বীপে গিয়ে হাজির। অবশ্য একথা তখন জানতে কেউ পারে নি, পরে প্রকাশ হ'য়ে পড়লো। সেই সবজান্তা আইনজ্ঞ বাস্তুঘুঘুটী বেগতিক দেখে একেবারে গা ঢাকা দিল। রৈলো কেবল তালুকদার দাদা। ব্যাঙ্কের দরজায় চাবি তালা পড়ে গেলো—তালুকদারের সার্ভিস্ সিকিউরিং এজেন্সির আড্ডাখানায়, পাওনাদারেরা জমায়েত হ'য়ে মহা হৈ চৈ ক'রতে সুরু ক'রল। দাদা যোড়-হাত করে মিষ্টি কথায় সকলকে বুঝিয়ে বল্লে, মজুমদার নিরুদ্দেশ হয়নি—সে শিগগির কলিকাতায় অনেক টাকা নিয়ে ফিরে আসবে; তখন যার যত পাওনা গণ্ডা পাই বাট মিটিয়ে দেবে। যে সকল লোক সার্ভিস সিকিউরিং এজেন্সি মারফত নগদ ৫৬৲ টাকা আক্কেল সেলামী দিয়ে লেবারার্স ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অর্গানাইজার, ইন্সপেক্টর প্রভৃতি বড় চাকুরি পেয়ে নিজেদিগকে একদিন ভাগ্যবান ব'লে মনে করেছিল, তারা তাদের দেওয়া সেলামীর টাকার দাবী করতে লাগলো। তালুকদার তখন প্রমাদ গণল। তার অন্যতম পাটনার Mr. Alfred ওরফে অমূল্য মুখুয্যের সঙ্গে পরামর্শ করল। এই মুখুয্যের ঘটে অনেক বুদ্ধি থাকৃতেও সে বড় উকীল ব্যারিষ্টারগণের সঙ্গে পরামর্শ করে জানলে যে, এই ব্যাপারে কেউ তাদের কোম্পানীর কিছু করতে পারবে না। আইনের বেড়া জালের বাইরে তারা নাকি আছে। রেবতি দাদা সত্যি সত্যিই হাঁদা রকমের! আহা বেচারি! সে মুখুয্যের হাতের পুতুলমাত্র। যাহোক, নিজেদের মাথা বাঁচাবার জন্য Bharat Service Securing Agency পট করে তার রাশ নামটা পাল্টে ফেলে, ডাক নাম রাখলো—"The Universal Service Procuring Bureau" ঠিকানা ঐ ২১নং ওল্ডকোর্ট হাউস ষ্ট্রীটই রইল বটে, কিন্তু এবারে একটা বড় রকমের হল ভাড়া নিয়ে আসবাব পত্র ভাল রকম করে সাজিয়ে, তার সঙ্গে আরো কি একটা নূতন রকমের কারবার জার্ম্মানির সঙ্গে করতে সুরু করলে। শুনতে পাই একটা বড় রকমের কাৎলাকে ধাল করেই এই নূতন ব্যবস্থা

করেছিল। সাহেব মহলে অফিসের শোভা বাড়াবার জন্য একটা ফিরিঙ্গি যুবতীকে রাখলে টাইপিষ্ট। এমন ভাবে এবার কোম্পানি খাড়া করলে যে বেগতিক দেখলেই বেমালুম সরে পড়তে পারবে—কেউ তাদের কিছু করতে পারবে না। এবার আমার রেবতী দাদার মুখে হাসি দেখা দিল। দাদার নেয়াপাতি ভুঁড়িটা এত দিন নানারকম দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে আমসী হয়ে গিয়েছিল, সেটীও দেখ্‌তে দেখ্‌তে গজিয়ে উঠলো। কিন্তু শত শত কর্ম্মচ্যুত লোকের সর্ব্বনাশ ক'রে তাদের দীর্ঘ নিঃশ্বাস রেবতী তালুকদারের অন্তর জালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিতে ছাড়ে নি। ভগবানের রাজ্যে পাপের শাস্তি পেতেই হ'বে। দাদার বরাতে সুখ ভোগ আর সইল না। অল্পদিন পরেই দাদার অন্তরাত্মা বন্ধু এ্যালফ্রেড সাহেব ওরফে অমূল্য মুখুয্যে এতদিনের পরিশ্রম লব্ধ টাকা কড়ি নিয়ে রেবতি তালুকদারকে পথের ভিখারি করে দিয়ে একদিন সত্যি সত্যিই নিরুদ্দেশ হ'লো। সে যে কোথায় পালিয়েছে, তা এখন পর্য্যন্ত কেউ জানে না। তাই বলি বাঙালি! তুমি Alfred সাজ আর Robertsই হও, Partnershipএ কাজ করলে তোমার পরিণাম এই রকমই হবে। তুমি যে তিমিরে আছ সেই তিমিরেই থাকবে। মন সাদা কর, বিলাতি জুয়াচুরী ছেড়ে দাও, হিংসা দ্বেষ ত্যাগ কর, তবে মানুষ হবে—তা নইলে এই রকম করেই পদে পদে লাঞ্ছিত অপমানিত এবং বিপন্ন হতে হবে।

(ক্রমশঃ)

কোহিনুর বা ভারত ভাগ্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(শ্রীগিরীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম্, ডি।)

মহারাজার অনুচরবর্গের মধ্যে যাঁহারা কোহিনুর চিনিত সকলেই এক বাক্যে "এই সেই কোহিনুর" বলিয়া মহারাজের সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন। মহারাজ প্রীত হইয়া সাহ সুজাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পরস্পরের পুনরায় মিলন হইল। রাজ মুকুট আদান প্রদান হইল। কোহিনুর রনজিতসিংহের হস্তগত হইলে, রণজিত সাহ সুজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"আপনি ইহার মূল্য কত অনুমান করেন"! হতভাগ্য সুজা এই উত্তর দিলেন যে "শুভাদৃষ্টই ইহার মূল্য।' মহারাজ সাহসুজাকে এককালীন ১২৫,০০০ এক লক্ষ পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রা এবং ৫০,০০০ পঞ্চাশ সহস্র টাকা মূল্যের একখানি বৃহৎ জায়গীর প্রদান করেন এবং কাবুল উদ্ধারে সুজাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। এইরূপে কোহিনূর পুনরায় ভারতে আনীত হইল। সাহ সুজা ও হামন সাহ লাহোর হইতে পলায়ন করিয়া ব্যাজেরী নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করিলেন এবং তথা হইতে বহু ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া ব্রিটিশ রাজ্যের শরণাগত হইলে, সহৃদয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাদের প্রত্যেককে বাৎসরিক ৬০,০০০ ষষ্ঠি সহস্র টাকা এবং তাঁহাদের জ্যেষ্ঠপুত্রদিগকে ৬০০০, ষষ্ঠ সহস্র মুদ্রা পেন্সন বন্দোবস্ত করিয়া লুধিয়ানাতে বাস স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ১৮২১ খৃঃ অঃ ভইক্টেকার এই লুধিয়ানেতে তাঁহাদের দর্শন লাভ করেন। এবং এই স্থানেই কর্ণেল প্লিমান লুধিয়ানার সেনাপতি জেনারেল স্মিথ সমীপে জানিতে পারেন যে তিনি অন্ধরাজ সাহ হামন প্রমুখাৎ এই কোহিনূর ইতিবৃত্ত শ্রবণ করেন। এই সাহ সুজা ১৮৩৯ লর্ড আয়ল্যাণ্ড কর্ত্তৃক কাবুলের সিংহাসনে স্থাপিত হয়েন। কিন্তু দুই বৎসর পরে সমগ্র ব্রিটিশ সেনা কাবুল হইতে প্রত্যাগমন কালে একাবারে বিনষ্ট হয়।

সাহ সুজার নিকটে প্রাপ্ত হীরকই যে কোহিনূর তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেননা মহারাজ রণজিৎ সিংহ দিল্লী ও কাবুলের বণিকদিগকে এই হীরক প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে ট্যাভারনিয়ার বর্ণিত কোহিনূর ও এই হীরক যে একই তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু ট্যাভারনিয়ার হীরকের ওজন ছিল ৩১৯ রতি। মহারাজ রণজিত সিংহ যখন কোহিনূর প্রাপ্ত হয়েন তখন তাহার ওজন ২২১½ রতি মাত্র। এই দুই প্রকার ওজন মধ্যে ৯৮ রতি হীরক কিরূপে অন্তর্হিত হইল তাহা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না।

এই কোহিনূর গ্রহণ ব্যাপারে বস্তুত রণজিৎ সিংহের কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না। ওফ বেগম ও সাহ সুজা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের স্বাধীনতার মূল্য স্বরূপ কোহিনূর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করেন। এবং পরে অঙ্গীকার পালনে ইতস্ততঃ করেন। ইহাতে সাহ সুজার আচরণই দোষাবহ। রণজিৎ সুজাকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া সন্ধিসূত্রে ন্যায়তঃ কোহিনূরের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই ঘটনা

দোষমূলক বলিয়া বর্ণনা করিয়া ইংরাজ-লেখকগণ আপনাদের কল্পনা প্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা ইতিহাসের সম্মান রক্ষা করিতে পারেন নাই। বলিতে কি যেল ম্যালিসন, টরেন্স লাভলো ক্যানিংহাম, নর্টন প্রভৃতি অপক্ষপাতী ইংরাজ লেখকগণের অভ্যুদয় না হইলে ভারতের ইতিহাস অলীক ঘটনায় পরিপূর্ণ হইয়া জনসমাজের অভিজ্ঞতা ঘোর ভ্রমান্ধকারে সমাচ্ছন্ন করিত। নবাব সিরাজদ্দৌলার চরিত্র বর্ণনা ইহার এক অতি উত্তম দৃষ্টান্তস্থল। সিরাজ-চরিত্র যতই কুৎসিৎ হউক না কেন, তাঁহার উপর যে সমস্ত অলীক অপবাদ আরোপ করা হইয়াছে, তাহা মানবে অসম্ভব। এইরূপে মহারাজ রণজিৎ সিংহ কোহিনূর অধিকারী হইয়া একখানি ব্রেসলেট মধ্যে কোহিনূর গ্রথিত করিয়া তাঁহার বাম বাহুতে ধারণ করিতেন।

কথিত আছে যে, শিলুকড (Silchured) নামক একজন বঙ্গদেশীয় বণিক লুধিয়ানা সহরে অবস্থিতি করিতেন। কার্য্যোপলক্ষে একদা তিনি লাহোরে গমন করেন। কোহিনূর হীরক একবার দর্শন করিবার জন্য মহারাজের অনুমতি প্রার্থনা করিলে মহারাজ তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করেন। কোহিনূর দেখিয়া শিলুকড এতদূর বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ ভূমিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কোহিনূরের অর্চ্চনা করেন।

রাজা ধ্যানসিংহ ১০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া একটী বেদী প্রস্তুত করাইয়া ১০ সহস্র মুদ্রা ব্যায়ে কাশ্মীর শাল দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। এই বেদীর উপরে মহারাজার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

মহারাজ রণজিৎসিংহ ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট সহ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহার রাজত্বকালে তিনি ইংরাজদিগের সহিত সন্ধিপালন করেন, আজীবনকাল তাহার সম্মাননা করিতে কদাপি উদাসীন ছিলেন না। অদম্য উৎসাহ ও অদ্ভুত বীরত্ব কৌশলে তিনি কেবল পঞ্জাব করায়ত্ব করিয়া নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, সিন্ধুনদ অতিক্রম পূর্ব্বক লড়শ্বেরার রণক্ষেত্রে অসাধারণ বীর্য্য প্রকাশ করিয়া আফগান ভূমে তাঁহার বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন। পঞ্চনদ একতানে শান্তিগান গাহিতে গাহিতে সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছিল। এক অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না। সুখ দুঃখ চক্রবৎ ঘুরিতেছে। পঞ্জাববাসীর সুখস্বপ্ন অচিরাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। সুখের আশা সব ফুরাইল। সৌভাগ্য-রবি চিরতরে অস্তমিত হইল। কালস্রোতে ক্রমে ১৮১৯ খৃঃ অঃ আসিয়া পৌছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের আশা ভরসা ফুরাইল। রণজিত কালগ্রাসে

পতিত হইলেন। যে কোহিনুর তিনি সর্ব্বদা বামহস্তে ধারণ করিতেন, মৃত্যুকালে স্বইচ্ছায় পুরীর ৺জগন্নাথ জিউর মুকুট শোভনার্থ তাহা রাখিয়া যান। মৃত্যুশয্যায় মহারাজ জগন্নাথ-দেবকে কোহিনুর প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। কোহিনুর কখনও কোন রাজবংশে চিরস্থায়ী সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হয় নাই—তাহা তিনি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া-ছিলেন। প্রবলপরাক্রান্ত নরপতিগণ এই হীরকের অধিকারী হইয়া অশেষবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। কিং (৭৩ পৃঃ) বলেন যে, তাঁহার মনে এই উদ্দেশ্য ছিল যে, দেবতাকে এই হীরক উপহার প্রদান করিলে বহুপুণ্য লাভ হইবে। এবং দেবানুগ্রহে তৎপ্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ও রাজ্য স্থায়িত্বলাভ করিবে। কথিত আছে যে, তিনি মস্তকসঞ্চালন করিয়া তাঁহার অভিলাষ ও অনুমতি স্পষ্টই জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং জমাদার খুবলাল সিং ও ধ্যানসিংকে এই হীরক আনয়ন করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই সাধু অভিলাষ সফল হইল না। কেহ কেহ বলেন যে, মহারাজ স্বয়ং এই হীরক পুরী প্রেরণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মহারাজার রত্নভাণ্ডারাধ্যক্ষ মিসর বেলিরাম সহজে এই বহুমূল্য হীরক কাহারও হস্তে প্রদান করিতে অস্বীকার করিলেন। মহারাজার স্বাক্ষরিত কোন অনুমতি পত্র না পাইলে, কেবল লোকমুখে তাঁহার অভিলাষ জ্ঞাত হইয়া কিরূপে এই মহার্ঘ রত্ন রাজকোষ হইতে বাহির করিবেন। বস্তুতঃ তাহা অসম্ভব বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। মহারাজার কর্ম্মচারীবর্গ এইরূপ অনুমতি পত্র লিখিতেছিলেন এমন সময় মহারাজার জীবনবায়ু বহির্গত হইল। কেহ কেহ বলেন মহারাজা এই হীরক গুরু রামদাস নামে উৎসর্গীকৃত করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি কোহিনূরের ভবিষ্যৎ জানিতে পারিয়াছিলেন। ভারতের মানচিত্র বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত দেখিয়া তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী "সব লাল হো যাগা" বলিয়াছিলেন তাহার সফলতার উপর কোহিনূরের ভাগ্য নির্ভর করিতেছিল। সম্ভবতঃ তাঁহার আদেশ কার্য্যে পরিণত হইলে অদ্যাপি ভারত-বক্ষ হইতে কোহিনুর বিচ্ছিন্ন হইত না। মহারাজ রণজিৎসিং কোহিনুর লাভ করিবার পর অমৃতসরে—রত্ন ব্যবসায়ী বণিকদিগকে আহ্বান করিয়া ইহার মূল্য নিরূপণ করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা উত্তর দেন যে ইহার মূল্য কোন সংখ্যা দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। সাহ সুজার মহিষী ওফা বেগমকে ও ইহার মূল্য নির্দ্দেশ করিতে অনুরোধ করিলে

তিনি বলেন যে পঞ্চলোষ্ট্র যদি কোন বলবান পুরুষ কর্ত্তৃক উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম ও উর্দ্ধ-দিকে নিক্ষিপ্ত হইলে যে পরিমাণ ভূমি চিহ্নিত করে, সেই ভূমি সুবর্ণ মুদ্রাদ্বারা পরিপূর্ণ হইলে, ঐ সুবর্ণরাশি কোহিনুরের তুল্য মূল্য হইতে পারে। কথিত আছে, কোন বৃটীশ রাজ-প্রতিনিধি রণজিৎসিংহ সমীপে লোক প্রসিদ্ধ কোহিনুর হীরকের মূল্য জিজ্ঞাসা করায়, তিনি হাস্য পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন "এস্কা কিম্মৎ পাঁচ জুতি" অর্থাৎ বলপ্রয়োগেই সকলে ইহা পূর্ব্বাধিকারীর নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন। অর্থদ্বারা এই হীরক পাওয়া যায় নাই।

মহারাজ রণজিৎসিংহের মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার বিস্তৃত রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। তৎপুত্র দিলীপসিংহ তৎকালে অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছিলেন। কিন্তু তখনও পঞ্জাবে এক তেজস্বিনী রমণী বর্ত্তমান ছিলেন তিনি নারী-জনোচিত সুকোমল গুণগ্রামে বিভূষিতা হইলেও বীরাঙ্গণা ও ভীমগুণান্বিতা ছিলেন। ইনি রণজিৎ মহিষী ঝিন্দন বা চন্দ্রা। পঞ্জাবের ইতিহাসে ইহার তেজস্বিতা ও শাসনক্ষমতা সমধিক প্রসিদ্ধা বীরাগ্রগণ্যা মেরায়া থারিসা, এলিজাবেথ প্রভৃতি রমণীগণের সহিত ঝিন্দন একাসনে আসীনা ও মানব সমাজে সমভাবে বরণীয়া হইয়াছেন।

ক্রমশঃ

পরলোকের পরিচয়

(শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

(তৃতীয় প্রসঙ্গ)

৩। মৃত্যুর পর।

মৃত্যু বা জড়দেহ ত্যাগের পর আত্মা পর-লোকে বা সূক্ষ্ম চৈতন্যময় আত্মিক জগতে গমন করে। এখানে আসিয়া আত্মাকে তাহার পূর্ব্ব কর্ম্মার্জ্জিত বাসনার প্রভাবে অবস্থান করিতে হয়। আত্মোন্নতির ইচ্ছা বলে বা পার্থিব পরিজন-দিগের প্রার্থনা বলে, পরলোকস্থ আত্মার ক্রমশঃ উর্দ্ধগতি হইয়া থাকে। পারলৌকিক জগৎবাসী মহাত্মারা তখন তাঁহাদিগের সহায়তা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক একের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও অপরের অপ্রতিহত আকর্ষণ বলে নিম্নমুখীন্

আত্মা এই ভাবে পরলোকে ক্রমশঃ উন্নীত হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন নিরানন্দময় অবস্থা হইতে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত আনন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তবে ইহা অনেক সময় সাপেক্ষ।

যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনে নানাবিধ কুকর্ম্মে রত হইয়াছিল, কেবল নীচ কর্ম্মে ও চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল মৃত্যুর পরে তাহার আত্মা একেবারে কখনও সূক্ষ্ম চৈতন্যময় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না। তাহার মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা অবসাদময়, ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। সে অবস্থায় তাহার আত্মা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের জন্য যখন অনুতাপ করিতে থাকে, তীব্র বাসনা বলে উর্দ্ধগতি লাভ করিতে চায় তখন তাহার অবস্থান্তর হইয়া থাকে এবং তখন সেই আত্মা ক্রমশঃ উর্দ্ধমুখে ধাবিত হইতে পারে কিন্তু যতদিন এ অবস্থা না আসে ততদিন অবধি তাহাকে অজ্ঞানান্ধতাময় অবস্থায় থাকিতে হয়। এই জন্য হিন্দু শাস্ত্রে শ্রাদ্ধ তর্পণের ব্যবস্থা আছে। এই সকল ক্রিয়ায় আন্তরিক ভাবে মানসিক শক্তি চালনা করিলে তাহা অভীপ্সিত কেন্দ্রে গিয়া আঘাত করে, বাঞ্ছিত লক্ষ্যে উপনীত হয়। তাহার ফলে নিম্নমুখীন্ আত্মা উর্দ্ধমুখে চালিত হয়।

আর যাঁহারা মর-জগতে সাত্ত্বিক ভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন, সদা সৎপথে চিন্তা-শক্তিকে চালনা করিয়াছেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম চৈতন্যময়, আনন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহ-সংসারের পদমর্য্যাদা জ্ঞান গরিমার তথায় কোন মূল্য নাই। রাজা হউন, আর রাখালই হউন, পণ্ডিত হউন বা মূর্খ হউন দেহ ব্যতিরেকে মন বুদ্ধি ও আত্মা যাহার যেমন তিনি সেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। পরজগতের সাম্য নীতি বড়ই কঠোর। সে নীতি পার্থিব ধনীকে সম্মান করে না, দরিদ্র ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইলেও পরলোকে সে রাজসম্মান প্রাপ্ত হয়, আর মহাধনী মহাপণ্ডিত, ধর্ম্মসম্পদহীন হইলে পরলোকে সে অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না। ইহ-পরজগতের "উন্নতি" শব্দে এইটুকুই তফাৎ। এখানে ধন, মান, পদ গৌরবকে লোকে উন্নতি বলে, আর সেখানে আত্মার উন্নতি প্রকৃত উন্নতি নামে অভিহিত হয়। তাই সেখানে চণ্ডালও অনায়াসে উন্নতি লাভ করিতে পারে, আর ব্রাহ্মণ নামধারী হইলেও তাহাকে পতিত হইতে হয়।

মৃত্যুর পর যখন আত্মা জড়দেহ ছাড়িয়া সূক্ষ্ম জগতে প্রবেশ করে, তখন তাহার একটা আচ্ছন্নতা আসে। তাহার জড়দেহ হইতে যে তাহার মুক্তি হইয়াছে, সে যে এখন জড়জগৎ

ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম-জগতের নিয়মাধীন হইয়াছে, তাহা প্রথমে বুঝিতে পারে না। এ অবস্থায় অনেকে প্রথমে মনে করে যে তাহারা স্বপ্ন দেখিতেছে মাত্র, তাহাদের ঘোর নিদ্রা তখনও ভাঙ্গে নাই। সময়ে সময়ে এমনও দেখা যায় যে দেহ, ত্যাগের বহুক্ষণ পরে আত্মা বুঝিতে পারে যে তাহার জড়দেহের বন্ধন মুক্ত হইয়াছে। তখন তাহার মনে একটা দারুণ বিস্ময়ের ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। সে ভাবে যদি আমার মৃত্যু হইয়াছে, তবে আমি কোথায় রহিয়াছি, মরিলাম তো আবার আমার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছি কেন? বাস্তবিক ইত্যাদি রূপ প্রশ্ন সাধারণ লোকের মনে মৃত্যুর কয়েকদিন পরে বা অব্যবহিত পরে স্বভাবতঃ আসিয়া থাকে। কারণ সে তখন জড়েরও তারতম্য বুঝিতে পারে না। জড় যেমন প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী স্থানাবরোধের অধীন সূক্ষ্ম যে তেমন নয়, তাহা কি করিয়াই বা তখন তাহার বোধ হইবে? সে যখন দেখে যে নর-দেহ ধারণ করিয়া তাহার গতিবিধির যে সকল প্রতিবন্ধক ছিল, দেহত্যাগের পর তাহা আর নাই তখন সে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হয়। লব সাহেব যে সকল পরজগৎবাসী আত্মাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবার কোন কোন সম্প্রদায়ের মানব তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের অধীন হইয়া পরলোকে গমন করিয়া প্রথমে দারুণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়। খৃষ্টানদিগের মধ্যে কাহারও বিশ্বাস এইরূপ যে মৃত্যুর পর **বিচারের দিন** পর্য্যন্ত সকল প্রাণীকে অন্ধকারময় স্থানে অবস্থান করিতে হইবে তৎপরে যাহারা পাপী তাহারা অনন্তকাল জ্বলন্ত পাবকে পড়িয়া থাকিবে আর যাহারা পুণ্যাত্মা তাহাদিগকে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে অধিকার দেওয়া হইবে। এই স্বর্গ ও নরকের কল্পনা বলে কোন কোন খৃষ্টান মৃত্যুর পর পরলোকের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া যে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ লব সাহেব অন্যান্য ঘটনার মধ্যে পণ্ডিত ও পারলৌকিক তত্ত্বদর্শী সেড্ বিটার সাহেবের "ইন্‌ভিসিবল্ হেল্‌পার" গ্রন্থ হইতে একজন ইংরাজ সেনাপতির পারলৌকিক কাহিনী উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত সেনাপতি মহাশয় দেহত্যাগের তিনদিন পরে যখন দেখিলেন যে তাহার আত্মা দেহ বিমুক্ত হইয়াও অবস্থান করিতেছে, তখন তাহার আর কৌতূহলের সীমা রহিল না।

তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"এতো ভারি মজা, আমি মরিয়াও বাঁচিয়া আছি। তবে কি আমি সত্য সত্য মরি নাই?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার সহিত অপর একটী আত্মার সাক্ষাৎ হয়। সেনাপতি তাহাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া যখন অবগত হইলেন যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, এবং তাহার আত্মা এখন সূক্ষ্ম জগতের নিয়মাধীন হইয়াছে ও তিনি তাঁহার মানসিক শক্তির অনুসারে সেই জগতে অধিকার পাইয়াছেন, তখন তাঁহার মন হইতে স্বর্গ ও নরকের ধারণা বিলুপ্ত হইল ও সকৌতুকে বলিলেন—ইহা যদি স্বর্গ হয়, তাহা হইলে ইহার সহিত আমাদের পার্থিব ধারণার সাদৃশ্য নাই, আর যদি নরক হয়, তাহা হইলে এ অবস্থা ধর্ম্মযাজকদিগের বর্ণনা হইতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। ক্রমশঃ—

বিবিধ-প্রসঙ্গ ও আলোচনা।

লাভ লোকসানের কথা না ভেবে শুধু সাহসের জন্য সাহসের, পৌরুষের জন্য পৌরুষের কাজ করা যৌবনের ধর্ম্ম। মানুষের একলার পক্ষে যাহা সত্যি, তাহা মানব জাতির পক্ষেও সত্যি। যে জাতি বার্দ্ধক্যে জরাগ্রস্ত সে সাহসের কাজ করতে এগুবে না। পাশ্চাত্য জাতি সকল যদিও তাদের প্রবৃত্তি ও সভ্যতার প্রকৃতি তাদের মারামারি কাটা কাটির মধ্যে নিয়ে গেছে—তবুও জরাগ্রস্ত নয়। তারা যৌবনের উৎসাহে এবং শক্তিতে পরিপূর্ণ। তাদের সভ্যতা ও প্রকৃতি যখন সাত্বিক ভাবের দিকে ফিরবে তখন তারা যে সব জাতি এখন তাদের জরা ও অবসাদকে সাত্বিকতার পরিচয় বলে নিজেদের সান্ত্বনা দেয় এবং জগতের সমক্ষে আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে চায়, তাদের সাত্বিকতায়, ঢের পেচনে ফেলে যাবে। জড়ভাব অপৌরুষ নির্জীবতা সাত্বিকতা নহে; ওটা তামসিকতারই অন্য একটী রূপ। ভারতের এখন এই অবস্থা।

ব্যক্তিতে এবং জাতিতে এই তফাৎ যে ব্যক্তির যৌবন আর ফিরে আসে না কিন্তু জাতির যৌবন আবার ফিরতে পারে। আজ যে জাতি জরাগ্রস্ত ও মুমূর্ষু আবার সে জাতি নব যৌবন এবং নব জীবন লাভ করতে পারে।

এই নব জীবন এবং এই নবযৌবন ভারতকে পেতে হবে; আর জড়তাকে আধ্যাত্মিকতার

উচ্চতর বলে চুপ করে এক সঙ্গে জটলা করতে করতে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করলে চলবে না।

গৌরীশঙ্কর চূড়ায় উঠতে গিয়ে বার বার অকৃতকার্য্য হয়েও ইংরেজ জাত জেদ ছাড়ছে না। স্যার ফ্রান্সিস ইয়ং হাজব্যাণ্ড এ বিষয়ে টাইমসে একটী বেশ প্রবন্ধ লিখেছেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আলোচনার পাঠকদের দিবার লোভ সামলাতে পাচ্ছিনা। "গৌরীশঙ্কর নানা রকম ভীষণ অস্ত্র শস্ত্র সহকারে যুদ্ধ করচে। অলঙ্ঘ্য পাহাড়ে তাকে ঘিরে আছে। সে নিজে তুষার দিয়ে সব সময়ে আচ্ছাদিত। ঝড় ও হিমানী তাহার সাহায্য করে। কিন্তু সে অন্ধের মত যুদ্ধ করে। অভিজ্ঞতা দ্বারা শিক্ষা-লাভ তাহার হয় না এবং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর চেষ্টা আয়োজন সাহস দৃঢ়প্রতিজ্ঞা যেমন বাড়তে থাকে, তাহার আয়োজন, অস্ত্র, দৃঢ়তা অমনি সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে থাকে না। অন্য দিকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষের চেষ্টা, আয়োজন, সাহস প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা বাড়তে লেগেছে। নূতন নূতন বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করবার মত দৃঢ়তা বল, বুদ্ধি ও কর্ম্মিষ্ঠতা মানুষের আছে। পর্ব্বতে ও মানুষে এই লড়াইয়ে মানুষকে পাহাড় যতবার হারিয়ে দিচ্ছে মানুষ ভয় না পেয়ে, না দমে, ততবার নূতন উদ্যমে ও তেজস্বিতার সঙ্গে আবার তাল ঠুকে দাঁড়াচ্ছে।

সুতরাং গৌরীশঙ্করের বরাতে পরাজয় নিশ্চয় আছে। মানুষ নির্ম্মম ভাবে তাহার দিকে অভিযান করে চলেছে। ৪০ বৎসর আগে মানুষ খুব বিনয় নম্র ছিল, ২১০০০ ফুটের বেশী উঁচুতে উঠবার কল্পনার স্পর্দ্ধা তার হয় নাই। ২০ বৎসর আগে সে ২৩০০০ ফুট উঠে ছিল। ১৫ বৎসর আগে প্রায় ২৫০০০ ফুট পর্য্যন্ত চড়ে। দুই বৎসর পূর্ব্বে ২৭০০০ ফুট আরোহণ করে এবং গত মাসে ২৮০০০ ফুট পর্য্যন্ত চড়েছিল। তাহলে পাটীগণিতই দেখাচ্ছে যে ২৯০০০ ফুট চড়বার সময় এগিয়ে আসছে এবং গৌরীশঙ্কর নিশ্চয় হেরে যাবে।

ম্যালোরী ও আর্ভিন্ নামে ২ জন ইংরেজ ২৮০০০ ফুট উঠে ছিলেন তার পর আর তাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। এই দুই জন বীরের মধ্যে আর্ভিনএর বয়স মোটে ২১ বৎসর। এই সব দেখে আমাদের (ভারতবাসীর) মনে হতে পারে যে এমন করে জীবন দিয়ে লাভ কি? কিন্তু যৌবনধর্ম্মী মানুষের প্রকৃতি তাকে বাধা-বিঘ্নর সঙ্গে লড়াই করবার জন্য সব সময়ই প্রবৃত্ত করে। সে তখন লাভলোকসান দেখে না।

যাহা অজ্ঞাত তাহা জানবার চেষ্টা—যে তত্ত্ব কেহ কখনও আবিষ্কার করতে পারে নাই তাহা যত কঠিন হ'ক না কেন তাহা আবিষ্কার ক'রব—অসাধ্য সাধন করব দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় যে এত দিন কেহ অতিক্রম করে নি তাহা অতিক্রম করব—অজেয়কে জয় করব এসব আমরা নেহাৎ গোয়ার্ত্তুমি মনে করতে পারি কিন্তু যারা বার্দ্ধক্য জরায় অবসাদগ্রস্ত নহে—যৌবন শক্তিতে ভরপুর এবং পৌরুষই যাদের জীবনের লক্ষ্য সেই পাশ্চাত্য জাতি কিন্তু অন্য রকম মনে করে।

* * * *

আহমেদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে মৌলনা মহম্মদ আলি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাত্মার কারাগারে যাবার পর এতদিন স্বরাজ্যদল কংগ্রেসে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাত্মার আদর্শের সঙ্গে স্বরাজ্যদলের আদর্শের অনেক প্রভেদ। মহাত্মার প্রভাব তাঁহার অনুপস্থিতিতে এখনও লোকের উপর কতটা আছে এরই একটা হিসাব নিকাশ করবার জন্যই তিনি কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। এই নিয়ে স্বরাজ্যদলের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট মতোভেদ হয় এবং স্বরাজ্যদল প্রস্তাবগুলি কংগ্রেসের বিধি—বহির্ভূত বলিয়া সদলবলে সভা পরিত্যাগ করে যান। মহাত্মা তাঁর প্রস্তাবের কোন কোন অংশ বর্জ্জন করায় আবার আপোষে নিটমাট হয়।

* * * *

খবরের কাগজে নারী নির্য্যাতন সম্বন্ধে যত খবর পাওয়া যায় তার মধ্যে অধিকাংশ অত্যাচার মুসলমানেরা হিন্দু নারীর উপর করে। আমাদের মনে হয় মুসলমান সমাজে যথেষ্ট সামাজিক শাসন নাই এবং তাঁদের লোকমতও প্রবল নহে। কারণ এ রকম অত্যাচারে শুধু হিন্দু সমাজের ক্ষতি নহে—মুসলমান সমাজেরও ক্ষতি এমন কি সমস্ত জাতির ক্ষতি। আমাদের মনে হয় মুসলমান সমাজে সুশিক্ষা বিস্তার হলে কিছু প্রতিকার হবে। নারী নির্য্যাতন সমস্যাকে হিন্দু মুসলমানের ঝগড়ার নূতন একটা কারণ করলে কারোই লাভ নেই বরঞ্চ তাতে বিদেশী সরকারের সুবিধা হবে। তারা বেশ জোরগলায় এবং গম্ভীর ভাবে বলতে পারবে তোমরা কি স্বরাজ পাবার উপযুক্ত—এক দেশে বাস কচ্ছ—একই দেশের জল খাচ্ছ একই মায়ের অন্নে পুষ্ট হচ্ছ অথচ তোমরা সর্ব্বদা মারামারি করছ। তোমরা তোমাদের মা

বোনের ইজ্জতের সম্মান বোঝে না—যে জাত মাতৃজাতীর সম্মান করে না তারা আবার কোন কাজের উপযুক্ত।

হিন্দু মুসলমানের ঝগড়া বাঁধলে যে হিন্দুরাই হেরে যাবেই একথা বলা ভারী শক্ত। তবে লাভের মধ্যে কেবল ইংরাজ আমলা তন্ত্রের ক্ষমতা ও সুবিধা বাড়বে।

কিন্তু এ নারী নির্য্যাতন সমস্যার সমাধান আমাদের নিশ্চয়ই করতে হবে। নারীদের সম্বন্ধে পুরুষের ধারণা উন্নত করতে হবে। নারীদেরও এরকম শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা পুরুষদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে। এবং নারীদের সাহস ও শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে—যাতে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করতে সমর্থ হন।

নারী সম্বন্ধে সামাজিক আদর্শ যে যে উপায়ে উন্নত হতে পারে তার উপায় অবলম্বন করতে হবে। নারী রক্ষার জন্য পুরুষদের প্রাণপণ করতে হবে এবং নারীদের আত্মরক্ষার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, তবে নারীসমস্যার সমাধান হবে।

*　　*　　*　　*

"অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার লোক সংখ্যা অধিক। বাঙ্গালী না খাইয়া মরে, রোগে মরে, আবার বিকলাঙ্গের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বাংলার উন্মাদের সংখ্যা সকল দেশ অপেক্ষা অধিক। বাঙ্গালীকে সতর্ক হইতে হইবে।"

ধাঁধা।

(শ্রীহীরালাল গুপ্ত কবিরঞ্জন)

যুদ্ধের বারতা ভাই জিজ্ঞাসে ভায়েরে।
বিপক্ষের সেনাপতি কে আজ সমরে॥
বিপক্ষের সেনাপতি হয় অগ্রসর।
বাপের বৈমাত্র ভাই মম সহোদর॥
বল দেখি কোন জন জিজ্ঞাসে কাহারে।
বিপক্ষের সেনাপতি কে হয় সমরে॥

আমাদিগের এই পুস্তক-ভাণ্ডার হইতে যে সকল অমূল্য গ্রন্থরাশি প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতেছে এবং বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ—

সাধক শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

অন্যান্য গ্রন্থ

১। **আদর্শ ব্রাহ্মণ**—ভক্তি-রসাত্মক নাটক—বহু নাট্য সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত হইতেছে। মূল্য ১৲ টাকা।

২। **মায়ের খেলা**—ভক্ত-হৃদয়ের পবিত্র উচ্ছাস—মূল্য ।৶৹ আনা মাত্র।

৩। **মা আমার কাল' কেন?**—মাতৃরূপের-ব্যাখ্যা-বিবৃতি—মূল্য ।৶৹

৪। **শিবের বুকে শ্যামা কেন?**—প্রশ্নের সারসিদ্ধান্ত—মূল্য ।৶৹

৫। **বিজয় ভেরী**—ধর্ম্ম-বিষয়ক সিদ্ধান্ত—মূল্য /১৹ দেড় আনা।

৬। **মুক্তি**—মূল্য ৶৹ আনা।

৭। **সত্যালোকম্**—৶৹ আনা।

৮। **শোকশান্তি**—।৹ আনা।

শ্রীমৎ বিষ্ণুপুরী গোস্বামী বিরচিত ও শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল কর্তৃক পদ্যানুবাদ।

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলী—ভক্তি-রসাত্মক উপাদেয় গ্রন্থ। আইভরি কাগজে ৩২০ পৃষ্ঠা বাঁধা মূল্য—১৲ টাকা।

রামলীলা—উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত ভক্তিমূলক গ্রন্থ। মূল্য ॥৹ আনা।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

১। **রায়বাঘিনী** বা বঙ্গবীরাঙ্গনা—ব্রাহ্মণ রাজকন্যার অলৌকিক বীরত্ব-কাহিনী—সত্যঘটনা—মূল্য ১।৹ পাঁচ সিকা।

২। **বঙ্গবীর রণজিৎ রায়**—অপূর্ব্ব বীরত্ব-কাহিনী ইতিহাসের জীবন্ত চিত্র—১।৹ পাঁচ সিকা।

৩। **অভিরাম গোস্বামী**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক ঘটনাবলি পূর্ণ ভক্তিমূলক—মূল্য ১।৹ টাকা।

বঙ্গবিখ্যাত দার্শনিক

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন প্রণীত

১। **গীতায় ঈশ্বরবাদ**—১।৹

২। **উপনিষদ ব্রাহ্মণ**—১৷৹

হীরেন্দ্র বাবুর বহু গবেষণা ও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ গ্রন্থ—ধর্ম্মতত্ত্বের নিগূঢ় তত্ত্বের বিশদভাবে বিশ্লেষণ—যিনি না পড়িয়াছেন, তাহার জীবনই বৃথা।

* * * * *

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মূল—চণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সাধনসমর বা দেবী-মাহাত্ম্য—"ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ" নামে প্রকাশিত—২১৯ পৃষ্ঠা মূল্য ২৲ টাকা।

ঐ ঐ—২য় খণ্ড "বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ" নামে প্রকটিত—৩১২ পৃষ্ঠা—মূল্য ২৲ টাকা।

ঐ ঐ ৩য় খণ্ড "শুম্ভ-বধ—রুদ্রগ্রন্থি ভেদ" মূল্য ২৲ টাকা।

সত্য প্রতিষ্ঠা—মূল্য ।৹ আনা।

হাওড়া—৪নং তেলকলঘাট রোড, "কর্ম্মযোগ প্রেস" হইতে শ্রীযুগলকৃষ্ণ সিংহ
দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Alochona Patrika. Registered No. C. 116.